ইতিহাস পরিচয়



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a History Text Book for Class VII Vide T.B. No. VII/H/81/35 dt. 8. 1. 81

ইতিহাস পরিচয়

(মধ্যযুগ)

(সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য)

সুনীল কুমার ঘোষ এম. এ., বি. টি.
প্রধান শিক্ষক, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, কলিকাতা

লাইনাস পাবলিশার্স
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ, মে—১৯৮০
পরিমার্জিত সংস্করণ ফেব্রুয়ারী—১৯৮১
তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর—১৯৮১
চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারী—১৯৮৪

প্রকাশক
সুধীর পাল
লাইনাস পাবলিশার্স
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৮, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

মূল্য : ১৩·০০

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের কাহিনী

১। মধ্যযুগ—মধ্যযুগের কাল। ২। রোম সাম্রাজ্যের পতন—ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান—নতুন সামাজিক, আর্থিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা। ৩। যুগ-বিভাগের কথা।

মধ্যযুগ—মধ্যযুগের কাল : আদিকাল হতে আধুনিক কালের ইতিহাসকে ঘটনা অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি ভাগকে আমরা বলি যুগ। যেমন প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমরা প্রাচীন যুগের ইতিহাস পড়েছ। এই শ্রেণীতে পড়বে মধ্যযুগের কাহিনী। প্রাচীন যুগ শেষ হওয়ার পর এবং আধুনিক যুগ শুরু হবার আগের কাল হ'ল মধ্যযুগ। মোটামুটিভাবে পঞ্চম শতাব্দীতে রোমের পতন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমেরিকা আবিষ্কার এই এক হাজার বছরকে মধ্যযুগ ধরা হয়। এই এক হাজার বছরে পৃথিবীর প্রভূত পরিবর্তন ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগ ঠিক কখন শেষ হল এবং কখন মধ্যযুগ শুরু হল তা সঠিকভাবে হিসেব করা বেশ কঠিন। এমন কি পৃথিবীর সর্বত্র মধ্যযুগ একই সময়ে শুরু হয়নি—এটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

রোম সাম্রাজ্যের পতন—ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসান—নতুন সামাজিক, আর্থিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা : রোম সাম্রাজ্যের অবসান হয় ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। রোমের প্রথম রাজা ছিলেন রোম্যুলাস, রোমের শেষ সম্রাটের নামও ছিল রোম্যুলাস অগাস্টাস।

ইউরোপে যখন রোমের সাম্রাজ্য ছিল ভারতবর্ষ তখন শাসন করছিলেন গুপ্ত সম্রাটরা। গুপ্ত সম্রাটরা ভারতে এক সুমহান সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের মত গুপ্ত সাম্রাজ্যেরও পতন হয় পঞ্চম শতাব্দীতে। দুই সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী তোমরা আগে পড়েছ।

প্রাচীন যুগের সাম্রাজ্যের পতনের পর আগের বিধি-ব্যবস্থা আর রইল না। সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় গড়ে উঠল ছোট ছোট নতুন রাজ্য, নতুন জাতি। ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য ও জাতির সূচনা হ'ল।

বড় বড় সাম্রাজ্যের সামাজিক, আর্থিক ও প্রশাসন ভেঙ্গে গিয়ে গড়ে উঠল নতুন সামন্ততন্ত্র। শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটল, কৃষির প্রভূত উন্নতি হল, শিক্ষাক্ষেত্রে এল নতুন আদর্শ, নতুন প্রেরণা, চেতনা। মানুষ নতুন করে ভাবতে শিখল, নতুন নতুন বিষয় বিচার বিবেচনা করতে লাগল। আগের দিনের অন্ধবিশ্বাসের জায়গা নিল নতুন বিচার বুদ্ধি। চার্চের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হল এই যুগে। মধ্যযুগে মানুষ দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করল। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র একই ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠল না। কারণ এই পরিবর্তনের ধারা এবং প্রভাব সবদেশে একইভাবে এগিয়ে যায়নি।

যুগ বিভাগের কথা : ইতিহাসের যুগ বিভাগ করা হয়েছে আনুমানিক ভাবে। এই ভাগের কোন বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তি নেই। একটি ঘটনা শেষে অনিবার্যভাবে আর একটি ঘটনা ইতিহাসে ঘটে না। কোন বিশিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের যুগ ধরেছেন। রোমের পতন প্রাচীন যুগের একটি বিশেষ ঘটনা। তারপর হতেই প্রাচীন ব্যবস্থার পবিবর্তন হতে থাকে। দেখা দেয় সামন্ততন্ত্র, চার্চের প্রভাব বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা ঘটনা। তাই রোমের পতনকে ধরা হয় প্রাচীন যুগের অবসান। কলম্বাসের, আমেরিকা আবিষ্কার একটি বিরাট ঘটনা। এই ঘটনার পর হতেই পৃথিবীর চেহারা বদলাতে শুরু করে। তাই এই ঘটনা হতে আরম্ভ করা হয়েছে আধুনিক যুগ।

যুগ-বিভাগও আবার সব দেশে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। ইউরোপের আধুনিক যুগ ধরা হয় ষোড়শ শতাব্দী হতে অর্থাৎ আমেরিকা আবিষ্কারের সময় হতে। ভারতের আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়েছে তার প্রায় দু'শ বছর পরে। সম্রাট আওরংজেবের মৃত্যুর পর, ইউরোপের বণিকদের ভারতে আগমন ও ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের সময় হতে ভারতের আধুনিক যুগ গণনা করা হয়।

সব দেশের মানুষ এক সাথে এক ভাবে উন্নতি করতে পারে নি। কোন কোন দেশের মানুষ শীঘ্র উন্নতি করে সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়েছে, অন্য দেশের মানুষ তা পারেনি। তারা আগের দিনের আদর্শ অনুসরণ করে চলেছে। ইতিহাসে এটা সব কালেই ঘটে এসেছে। প্রাচীন কালে ভারতের, সুমেরের, মিশরের, চীনের মানুষ যত উন্নতি

করতে পেরেছিল, অন্য দেশ তা পারেনি। বর্তমান যুগেও ইউরোপ আমেরিকা যত উন্নতি করেছে এশিয়া-আফরিকার অনেক মানুষ তা পারেনি। এশিয়া-আফরিকার অনেক মানুষ এখনও মধ্যযুগের ধ্যান ধারণা নিয়ে বাস করছে। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের মত সেখানকার আদিবাসী আর কালো মানুষরা উন্নত নয়। পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি স্থানে এখনও বহু মানুষ আছে যারা ইউরোপ আমেরিকার চোখে মধ্যযুগের মানুষ।

অনুশীলনী

১। সাধারণ প্রশ্ন :

(ক) মধ্যযুগ কাকে বলে ? এই যুগের বৈশিষ্ট্য কি ?
(খ) ইতিহাসে যুগবিভাগ কিভাবে করা হয়েছে ?
(গ) 'সকল দেশে মধ্যযুগ একই সঙ্গে শুরু হয়নি'—ব্যাখ্যা কর।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কোন্ সালে শেষ রোমান সম্রাট ক্ষমতাচ্যুত হন ? সে সময় রোমের কে শাসনকর্তা ছিলেন ?
(খ) কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত সাধারণতঃ মধ্যযুগের কাল নির্ধারিত করা হয় ?
(গ) রোম সাম্রাজ্য শেষ হবার সময় ভারতে কোন্ রাজবংশ শাসন করতেন ?

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) মধ্যযুগে ক্রীতদাস প্রথার পরিবর্তে এল…।
(খ) ইউরোপে মধ্যযুগ শুরু ধরা হয়…থেকে।
(গ) ভারতে মধ্যযুগ শুরু…পতনের পর থেকে।
(ঘ) রোমের শেষ সম্রাট ছিলেন…।

৪। সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :

(ক) রোমের প্রথম রাজা ছিলেন রোম্যুলাস।
(খ) বাবরের মৃত্যুর পর ভারতের আধুনিক যুগ শুরু হয়।
(গ) পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে মধ্যধুগের আবির্ভাব ঘটে।
(ঘ) রোম সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

দ্বিতীয় অধ্যায় | ইউরোপের মধ্যযুগ

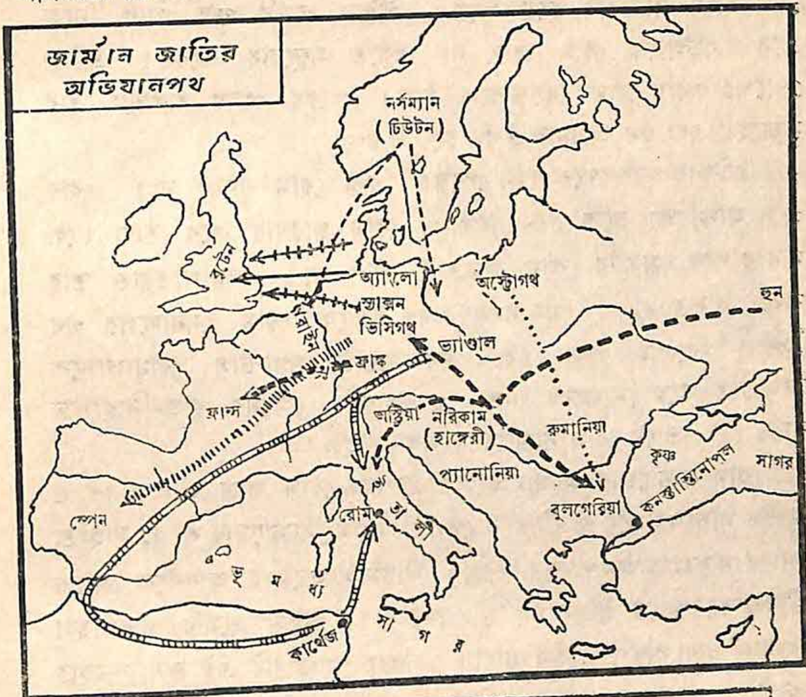
১। হূণ আক্রমণ—জার্মান জাতির উপর চাপ। ২। সাম্রাজ্যের অবসান—এ্যালারিক—এটিলা—গাইসেরিক। ৩। জার্মান জাতির সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি।

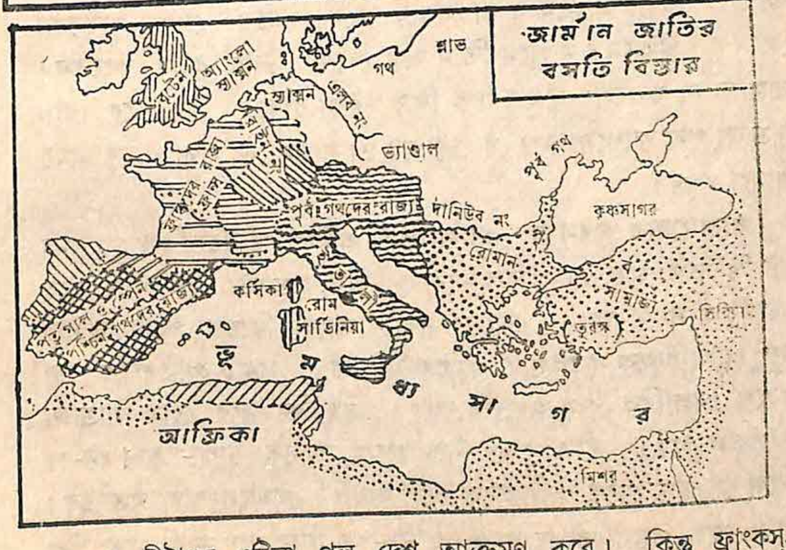
হূন আক্রমণ—জার্মান জাতির উপর চাপ: রোম সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানার বাইরে তখনকার জার্মানী খুব বড় দেশ ছিল। সেখানে বাস করত অনেক জাতি-উপজাতির মানুষ। ফ্রাংক্স্, ভেনডাল, ভিসিগথ, অসট্রোগথ, লমবারড, অ্যাঙ্গেল্স-স্যাকসন, জুটরা ছিল তার মধ্যে প্রধান। রোম সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য এদের রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ করে। বহুদিন ধরে একটু একটু করে এরা রোম সাম্রাজ্যের অঞ্চল দখল করে বসবাসের চেষ্টা করছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার হূন নামে আর এক বর্বর জাতি ইউরোপ আক্রমণ করে। জার্মানরা হূনদের বাধা দিতে না পেরে প্রাণ রক্ষার জন্য বেশি করে রোম সাম্রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সে সময় রোম সম্রাট ছিলেন দুর্বল। দুর্বলতার সুযোগে জার্মান জাতির লোকেরা সাম্রাজ্যের এক এক অংশ অধিকার করে নিয়ে বসবাস করতে থাকে। ফ্রাংক্স্রা নিল গল। দেশের নতুন নাম হল ফ্রানস্। ধীরে ধীরে তারা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল। ভেনডালরা গেল স্পেনে এবং উত্তর আফরিকায়। দুটি জায়গাই ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধিকারে। গথ-লমবারডরা ইটালীতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল। ইটালীর একটি প্রদেশের নাম এখনও লমবারডদের নামে লমবারডি রয়েছে। অ্যাঙ্গেল্স্-স্যাক্সন জুটরা ইংলণ্ড দখল করে নিল এবং সেখানে বসবাস করতে লাগল।

৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ভিসিগথদের নেতা এ্যালারিক ইটালী আক্রমণ করে। রোম অবরোধ করে ছয় দিন ধরে লুটতরাজ করে অনেক ধন-দৌলত নিয়ে সে রোম ছেড়ে যায়।

এরপর এল হূন আক্রমণ। হূনরা আক্ষরিক অর্থে বর্বর ছিল। এদের আদিবাস ছিল মধ্য এশিয়া। হত্যা আর ধ্বংস এদের জীবনের আনন্দ ছিল। এদের হাতে কত শহর আর মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার কোন হিসেব নেই। এদের নেতা বা রাজা ছিল এটিলা। মধ্য

এশিয়া হতে মধ্য ইউরোপের ডানিয়ুব নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এটিলার অধিকারে ছিল।





৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে এটিলা গল দেশ আক্রমণ করে। কিন্তু ফ্রাংক্স্, গথ ও রোমানদের মিলিত শক্তির কাছে সে পরাজিত হয়। পরের

বছর সে ইটালী অভিযান করে। উত্তর দিক হতে ইটালীতে প্রবেশ করে শহর নগর ধ্বংস করতে করতে সে রোমে এসে উপস্থিত হয়। রোম ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টান ধর্মের গুরু পোপ নিজে এসে এটিলাকে রোম ধ্বংস না করতে অনুরোধ করেন। এটিলা পোপের কথায় রোম ছেড়ে চলে যায়। পরের বৎসর অকস্মাৎ তার মৃত্যু হয় এবং হুন আক্রমণও বন্ধ হয়ে যায়।

এটিলার হাত থেকে রক্ষা পেয়েও কিন্তু রোম বাঁচল না। এবার এল আফরিকা হতে ভেনডালরা। রোম ছারখার করে তারা চলে যাবার পরে সম্রাটের কোন ক্ষমতাই রইল না। সেনাপতিরাও তার কথা মানত না। এমন সময় ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম সেনাদলের গথ সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং শেষ সম্রাট অগাস্টাস রোম্যুলাসকে নির্বাসিত করে নিজেদের নেতা ওডেকারকে রোমের রাজ-সিংহাসনে বসায়। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের অবসান হল।

রোম সাম্রাজ্যের অবসান হলেও ঐক্যবদ্ধ রোম সাম্রাজ্যের আদর্শ ও আইন মানুষের মনে স্থায়ী হয়ে গেল। রোম সাম্রাজ্যের শক্তি, সংহতি, গৌরব মানুষকে অনুপ্রাণিত করত। রোম সাম্রাজ্যের আদর্শকে আরও জীবন্ত করে রাখে খ্রীষ্টান ধর্ম ও পাদরীরা। খ্রীষ্টান ধর্মের ভাষা হল রোমান ভাষা অর্থাৎ লাটিন ভাষা। সকল পাদরীরাই এই ভাষা ব্যবহার করত। ভাষার মাধ্যমে তারা নৈকট্য বোধ করত। পোপ থাকতেন রোমে। খ্রীষ্টধর্মের মাধ্যমে তিনি অন্য দেশের উপর কর্তৃত্ব করতেন। সাম্রাজ্য না থাকলেও ধর্মের দিক দিয়ে ঐক্য রইল। এর পরে রোম সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপনের জন্য যে চেষ্টা হয় তা শার্লমানের কথা পড়ার সময় আমরা পড়ব।

সাম্রাজ্যের অবসান—এ্যালারিক, এটিলা, গাইসেরিক : সমর পটু ভিসিগথ নেতা এ্যালারিক বাইজানটাইন সম্রাটের সেনাপতি হয়ে ইটালী অভিযান করে। রোমের সম্রাট তাকে নিজের পক্ষে আনার জন্য এ্যালারিককে কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দেয়। সম্রাট প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে এ্যালারিক রোম অবরোধ করে। ছয় দিন ধরে রোম সাম্রাজ্য লুঠতরাজ করে। ভীত রোমবাসীরা তাকে অনেক টাকা-পয়সা-ধন-রত্ন দিলে সে রোম ছেড়ে সিসিলিতে চলে যায়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। রোম থেকে এ্যালারিক যে সমস্ত জিনিস-পত্র নিয়ে যায় তার মধ্যে ছিল তিরিশ হাজার পাউণ্ড গোলমরিচ।

এক বিচিত্র উপায়ে তার লোকেরা এ্যালারিককে কবর দেয়। সিসিলির যে স্থানে সে মারা যায় তার কাছে ছিল ছোট একটা নদী। বাঁধ দিয়ে নদীর জল বন্ধ করে নদীগর্ভে কবর খুঁড়ে এ্যালারিককে সমাহিত করা হয়। পরে বাঁধ ভেঙ্গে নদীর জল ছেড়ে দেওয়া হয়। কেউ জানতে পারল না কোথায় তার কবর। এ্যালারিকের লোকদের ভয় ছিল হয়তো রোমসম্রাট তার মৃতদেহকে সাজা দেবে তাই এই ব্যবস্থা।


এটিলা

হূন নেতা এটিলার কথা একটু আগেই পড়েছ। নৃশংসতা আর বর্বরতায় তার তুলনা নেই। ইতিহাসে সে 'ভগবানের অভিশাপ' বলে পরিচিত। কত মানুষ আর কত নগর যে সে ধ্বংস করেছে তার হিসাব নেই। একমাত্র বলকান অঞ্চলেই এটিলার দল সত্তরটি নগর ধ্বংস করে। বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও সে নিজে কিন্তু থাকত অতি সাধারণ ভাবে। নৃশংস হয়েও মানবতাবোধ কখনও কখনও তার মধ্যে জেগে উঠত। পোপের অনুরোধ রক্ষা করে সে রোম ধ্বংস না করেই ফিরে যায়। তার মৃত্যু হয় তার বিয়ের দিন। বিয়ের উৎসব আনন্দ চলার সময় সে হঠাৎ মারা যায়।

নিষ্ঠুরতার দিক দিয়ে ভেণ্ডাল নেতা গাইসেরিকও কম ছিল না। রোম আক্রমণ করে সে চরম অত্যাচার করে। নারীদের সম্মানও সে হানি করে। দুই কন্যাসহ রোমের সম্রাজ্ঞীকে সে বন্দী করে। অনেক টাকা নিয়ে তবে তাদের ছেড়ে দেয়। আফরিকার রোম সাম্রাজ্যের অংশ তার অধীনে ছিল। এক বিরাট নৌবহর ছিল তার। নৌবহরের সাহায্যে সে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপসমূহের ওপর দৌরাত্ম্যও করে বেড়াত। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সাথেও তার যুদ্ধ হয়। বাইজানটাইন

সম্রাট তার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল। ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গাইসেরিকের মৃত্যু হয়।

জার্মান জাতির সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিঃ রোমানরা জার্মান লোকদের বর্বর বললেও কিন্তু তারা সত্যিকারের বর্বর ছিল না। তারা ছিল নরডিক বা আর্যজাতির লোক। জাতিতে ছিল হিউটন বা টিউটন। তাদের দেহ হত দীর্ঘ গৌরবর্ণ, মাথায় লালচে চুল আর নীল চক্ষু। রোমানদের মত শহর গড়তে তারা জানত না। তারা গ্রামে মাটির বাড়িতে বাস করত। তারা গোরু, ঘোড়া, হাঁস, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পুষত। কৃষিকাজ জানত—তবে চাষবাস বড় একটা করতে চাইত না। মারামারি-কাটাকাটি করে রোজগার করার উপর তাদের বেশি লোভ ছিল। শিকার আর যুদ্ধ ছিল তাদের আনন্দ। খেলাধূলোও তারা পছন্দ করত। প্রত্যেক গ্রামের পাশেই খেলার মাঠ থাকত।

যুদ্ধ বিদ্যায় তারা পারদর্শী ছিল। তাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীও ছিল। যুদ্ধ করত তারা তীর, ধনুক, বর্শা, কুড়োল দিয়ে। স্ত্রীজাতিকে জার্মানরা খুব সম্মান করত। তাদের মেয়েরাও নির্ভীক ছিল। তাদের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন আর্যদের মত। গ্রাম্য সমাজের শাসনভার থাকত কয়েকজন সর্দারের ওপর। কতকগুলি পল্লী নিয়ে গড়া হত 'হানড্রেড'। একজন সর্দার হানড্রেড দেখাশুনা করত, তার উপর থাকত একজন রাজা। রাজাকে সাহায্য করার জন্য ছিল সভা ও সমিতি নামে দুটি সংস্থা। তাঁদের ক্রীতদাসও ছিল। ক্রীতদাসরা চাষবাস ও অন্যান্য কাজকর্ম করত। তাদের বলা হত 'সারফ'।

জার্মানরা অনেক দেবদেবীর পূজো করত। তাদের দেবতার নাম ছিল টুই, ওডিন, থর প্রভৃতি।

খ্রীষ্টান সাধুরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে জার্মান জাতির ভিতর খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। তাদের প্রচারের ফলে ও খ্রীষ্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু লোক নতুন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এই ধর্ম গ্রহণের ফলে তারা ক্রমশঃ উন্নত হয়ে ওঠে। তারা রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে আস্তে আস্তে মিশে যায়। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য আর থাকে না। এখনকার ইউরোপের সভ্য মানুষের এরাই ছিল পূর্ব পুরুষ।

অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) রোম সাম্রাজ্যের পতন কিভাবে হল ?

(খ) রোমানরা কাদের বর্বর বলত ? কেন বলত ?

(গ) ইউরোপে বর্বরজাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(ঘ) হূনরা আদিতে কোথায় বসবাস করত ; কিভাবে তারা ইউরোপে এল এবং কোথায় কোথায় বসতি বিস্তার করল ?

(ঙ) এটিলা কে ? তার রোম অভিযান বর্ণনা কর।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) ইউরোপের বর্বর জাতিদের আদিবাসস্থান কোথায় ছিল ? কেন তারা রোম সাম্রাজ্যে আসে ?

(খ) ফ্রাংক্স্রা কোন্ দেশে শেষ পর্যন্ত বসবাস করে ? সে দেশের পূর্ব নাম কি ?

(গ) ভেনডালদের প্রসিদ্ধ ক'জন নেতার নাম কর।

(ঘ) সাম্রাজ্যের পতনের পর রোমের প্রথম রাজার নাম কি ?

(ঙ) এ্যালারিক কে ? কোথায় তিনি মারা যান ? কোথায় তাকে সমাধি দেওয়া হয় ?

৩। **টীকা লিখ :**

(ক) টিউটন, (খ) এ্যালারিক, (গ) সারফ, (ঘ) হানড্রেড, (ঙ) এটিলা।

৪। **সঠিক উত্তরটি বেছে দাও :**

(ক) হূনগণের আদিবাস ছিল (পূর্ব ইউরোপ, মধ্য এশিয়া, ভারতবর্ষ)

(খ) গলদেশের বর্তমান নাম (জার্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স)

(গ) গাইসেরিক ছিলেন একজন (ভেনডাল, গথ, হূন)

(ঘ) জার্মানরা ছিল (স্যাক্সন, নরডিক্, হূন) জাতির লোক।

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) এটিলা গল দেশ আক্রমণ করেন—খ্রীষ্টাব্দে।

(খ) রাজাকে সাহায্য করার জন্য জার্মানদের ছিল দুটি সংস্থা—ও—।

(গ) জার্মানদের কতকগুলি পল্লী নিয়ে গড়া হত—।

(ঘ) বাইজানটাইন সম্রাট—গাইসেরিককে দমন করেন।

তৃতীয় অধ্যায় | ইউরোপের অন্ধকার যুগের কাহিনী

১। অন্ধকার যুগ—কেন অন্ধকার যুগ বলা হয়। ২। লেখাপড়ার চর্চা। ৩। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব।

অন্ধকার যুগ—কেন অন্ধকার যুগ বলা হয় : ইউরোপের মধ্য-যুগের ইতিহাসে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তিনশ' বছর অন্ধকার যুগ বলে পরিচিত। এটা সত্যি নয়, যে বর্বর জাতির আক্রমণেই ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই সময়টাকে অন্ধকার বলা হয় দুই অর্থে। প্রথম অর্থ হ'ল—এই সময়ের সম্পূর্ণ ইতিহাস স্পষ্ট করে জানা যায় না। এই সময়ের কথা কেউ লিখে রাখেনি। অনেকটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এই সময়ের ইতিহাস রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ হ'ল—এই সময় সাধারণ মানুষদের মনও ছিল অন্ধকার। লেখাপড়া বিদ্যা চর্চা মানুষের মনের প্রসারতা বাড়ায়, জ্ঞানের আলোকে মানুষ ভালমন্দ বিচার করে। এই সময়ের অধিকাংশ মানুষ লেখাপড়া জানত না। লেখাপড়া চর্চা তাদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল না।

কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, রোম সাম্রাজ্যের আমলে লেখা-পড়া করা হত, বিদ্যার মূল্য ছিল। কিন্তু যে বর্বর জাতি সাম্রাজ্য ভেঙ্গে নতুন রাজ্য গড়ে শাসন করতে শুরু করেছিল তারা লেখাপড়া জানত না, পড়াশুনার প্রয়োজন বোধ করত না। মহামূল্য পুঁথি-পত্র নির্দ্বিধায় পুড়িয়ে ফেলত। গ্রীসে ও রোমে তারা কত যে লাইব্রেরী ধ্বংস করেছে তার হিসেব নেই। লেখাপড়া যারা করত আক্রমণ-কারীরা তাদের অবজ্ঞা করত। এথেন্স শহরে প্রবেশ করে গথরা সেখানকার মানুষদের বই পড়তে দেখে অবাক হয়েছিল। তারা বুঝে উঠতে পারল না মানুষ যুদ্ধ না করে কি করে পুঁথি-পত্র নিয়ে জীবন কাটায়!

লেখাপড়ার চর্চা : এই যুগে সাধারণ মানুষ পড়াশুনা না করলেও লেখাপড়ার চর্চা যে একেবারেই হত না তা বলা চলে না। লেখাপড়া করতেন খ্রীষ্টান সাধু সন্ন্যাসীরা। এই যুগে খ্রীষ্টানধর্ম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। অনেক জায়গায় গীর্জা প্রতিষ্ঠা হয়। পুরোহিত বা প্রিসটরা ধর্ম প্রচার করতেন।

পুরোহিতদের অজ্ঞ মূর্খ হলে চলে না। ধর্মের বিষয় তাঁদের জানতে হয়। তাই তাঁরা লেখাপড়া করতেন। ধর্ম সংক্রান্ত বই-পত্রই তাঁদের পড়তে হত। কোন কোন সাধু সন্ন্যাসী লোকালয় ছেড়ে বনে-জঙ্গলে গিয়ে নির্জনে বসে সাধনা করতেন, জপ-তপ, করতেন। তাঁরা যেখানে বাস করতেন সে জায়গাকে বলা হত 'মোনাসটারী' বা সাধুদের আশ্রম। গাছ কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে তাঁরা আশ্রম বানাতেন। আশ্রমের শান্ত পরিবেশে তাঁরা পড়াশুনা করতেন। পুরানো বই-পত্র আবার নতুন করে নকল করতেন। এইভাবে সাধু সন্ন্যাসীরা লেখাপড়ার অভ্যাস বাঁচিয়ে রেখেছিল। সন্ন্যাসীদের মঠ বা আশ্রম কেউ আক্রমণ করত না। সন্ন্যাসীরা যত্ন করে তাঁদের বই-পত্র রাখতেন। দস্যুদের আক্রমণের হাত হতে বাঁচাবার জন্য অনেক সময় গ্রামবাসীরাও তাদের জিনিস-পত্র, শিল্প-সামগ্রী, চিত্র প্রভৃতি আশ্রমে রেখে যেত। পরবর্তী-কালে মোনাসটারীতে অনেক মহামূল্যবান চিত্র ইত্যাদি শিল্প সামগ্রী পাওয়া গেছে।

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব : খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকরা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। মানুষের উপকার করা ছিল তাদের ব্রত। সাধারণ মানুষকেও তারা অবজ্ঞা অবহেলা করতেন না। দুঃখের সময়, শোকের সময় তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন, তাদের সান্ত্বনা দিতেন। মঠের সাধু সন্ন্যাসীরাও নানাভাবে গ্রামের মানুষের সেবা করতেন। আক্রমণকারী দস্যুরা লুঠপাঠ করে চলে গেলে সাধুরা গ্রামবাসীর পুনর্বাসনে সাহায্য করতেন। বিনিময়ে তাঁরা কিছু নিতেন না। তাঁদের নিঃস্বার্থ জনসেবার আদর্শে সকলেই খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়। খ্রীষ্টধর্মে যাদের বিশ্বাস ছিল না তারাও নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে মানুষ উন্নত জীবনযাপন করতে শিখল, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতেও শিখল। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই রাজা ও খ্রীষ্টান চার্চ পরস্পর মিলিতভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ রোম সাম্রাজ্যের চিন্তাধারা চার্চ ও রাজন্যবর্গকে উৎসাহী করে তুলেছিল।

তার ফলে তথাকথিত আন্ধকার যুগে সাধারণ মানুষের মনে খ্রীষ্টান ধর্ম যে আলোর শিখা জ্বালাবার চেষ্টা করেছিল বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সহযোগিতায় তার প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনের গভীরে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাদের নৈতিক জীবনকে উন্নত করে তুলতে সাহায্য

করেছিল এই খ্রীষ্টধর্ম। তাই এই যুগ প্রকৃত পক্ষে 'অন্ধকার যুগ ছিল না।

অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) অন্ধকারের যুগ বলতে কি বোঝ? কোন্ সময়কে অন্ধকারের যুগ বলা হয়?

(খ) অন্ধকারময় যুগে ইউরোপে শিক্ষাদীক্ষার অবস্থা কেমন ছিল?

(গ) অন্ধকারময় যুগে সত্যই কারা শিক্ষাদীক্ষার চর্চা করতেন এবং কিভাবে?

২। **টীকা লিখ :**

মোনাসটারী।

৩। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) অন্ধকার যুগে খ্রীষ্টান ধর্মের বিস্তৃতি রুদ্ধ হয়।

(খ) সেই যুগে পুরোহিতরা লেখাপড়া জানতেন।

(গ) 'মোনসটারী গুলি ছিল অন্ধকার যুগের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র।

(ঘ) ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে রাজা ও খ্রীষ্টান চার্চের বিরোধ লাগলো।

চতুর্থ অধ্যায় | বাইজানটাইন সভ্যতা

১। কনস্তান্তিনোপলে নতুন রাজধানী—খ্রীষ্টধর্মের রাষ্ট্রধর্ম মর্যাদা। ২। জাসটিনিয়ানের আমল ৩। জাসটিনিয়ান-বিধান ৪। ব্যবসা-বাণিজ্যে কনস্তান্তিনোপলের গুরুত্ব। ৫। বাইজানটাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

কনস্তান্তিনোপলে নতুন রাজধানী—খ্রীষ্টধর্মের রাষ্ট্রধর্ম মর্যাদা : রোমের সম্রাট আগাস্টাস কনস্টানটাইন চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এশিয়া মাইনরের বাইজানটাইন শহরে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তখন রোম সাম্রাজ্য খুব বড় ছিল। রোমে বসে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুশাসন বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশের শাসনের সুবিধার জন্য নতুন রাজধানী করা হয়। বাইজানটাইন নাম বদলিয়ে সম্রাটের নামে রাজধানীর নাম হয় কনস্তান্তিনোপল।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে গ্রীসের ব্যবসায়ীরা বাইজানটাইন শহরের গোড়াপত্তন করেছিল। প্রাচীন নাম অনুসারে এখানকার সভ্যতাকে বলা হয়েছে বাইজানটাইন সভ্যতা।

সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই ধর্মকে তিনি রাষ্ট্রের ধর্ম করেন (৩২৩ খ্রীঃ)। রোমের মানুষেরা এই ধর্মকে গ্রহণ করেছিল। বাইজানটাইনেও সম্রাট খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন এবং রোমের মত এখানেও এই ধর্ম রাজধর্ম বা সরকারী ধর্মের মর্যাদা লাভ করে।

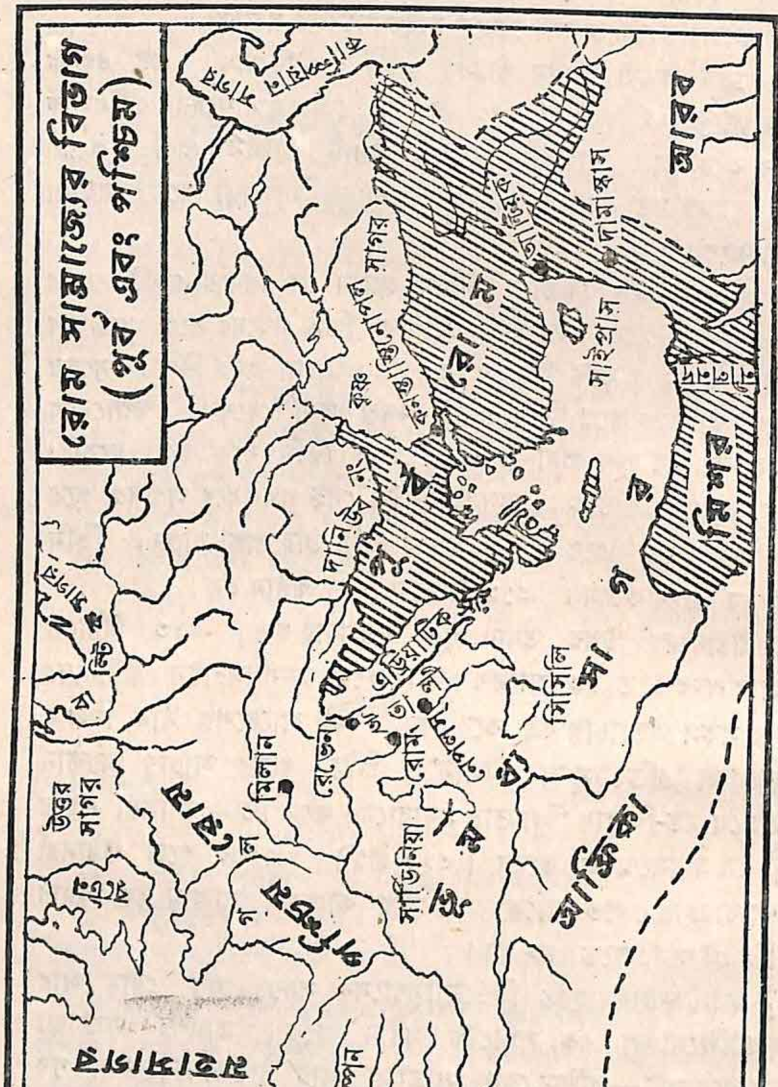
কনস্টানটাইন কিভাবে খ্রীষ্টান হলেন সে বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। গল্পে বলা হয়, একবার তিনি গথদের সঙ্গে যুদ্ধে খুব বিপদে পড়েন। যুদ্ধে তাঁর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কমই ছিল। যুদ্ধের আগের রাত্রিতে স্বপ্নে তিনি একটি জ্বলন্ত ক্রুশ দেখেন। স্বপ্নাদেশে তাঁকে বলা হয় ক্রুশ প্রদর্শিত পথে গেলে তিনি যুদ্ধে জয়ী হবেন। ক্রুশ খ্রীষ্টধর্মের প্রতীক। কনস্টানটাইন সেই পথ ধরে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধে জয়ী হন। এতে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বাড়ে। তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করেন। ৩১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খ্রীষ্টান হন।

খ্রীষ্টানদের উপর তখন খুব অত্যাচার হত। ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে মিলান শহর হতে এক আদেশ জারী করে কনস্টানটাইন খ্রীষ্টানদের উপর সকল অত্যাচার বন্ধ করে দেন। এই আদেশের নাম মিলান অনুজ্ঞা বা 'এডিকটস্ অব মিলান'। খ্রীষ্টান ধর্মের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে যে মত-বিরোধ ছিল তার সমাধানের জন্য তিনি নিসিয়া শহরে এক ধর্ম মহাসম্মেলন করেন (৩২৫ খ্রীঃ)। এরপর হতে খ্রীষ্টানরা ভাল ব্যবহার পেতে থাকে। রবিবার কাজকর্ম দোকান বন্ধ করার রীতি এই সময় হতে শুরু হয়।

কনস্টানটাইন হতে থিওডোসিয়াসের সময় পর্যন্ত রোম আর কনস্তান্তিনোপল এক সম্রাটের অধীন থাকে। তারপর সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়—পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য আর বাইজানটাইন বা পূর্ব রোম সাম্রাজ্য। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমের পতনের পরেও হাজার বছর পূর্ব রোম সাম্রাজ্য টিকে ছিল। পরে তুরস্ক কনস্তান্তিনোপল অধিকার করে (১৪৫৫ খ্রীঃ) নেয়।

জাসটিনিয়ানের আমল : কনস্তান্তিনোপল আলাদা সাম্রাজ্য হওয়ার পরে আটজন সম্রাট রাজত্ব করেন। তারপর সিংহাসনে বসেন,

জাসটিনিয়ান। কনস্তান্তিনোপলের সম্রাটদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনি আটত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। জাসটিনিয়ানের অসাধারণ



প্রতিভা ছিল। তাঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। দিন-রাত সমানভাবে তিনি খাটতে পারতেন। রাজকার্য ছাড়া তিনি শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীত খুব ভালবাসতেন। ধর্ম বিষয়েও তাঁর

গভীর অনুরাগ ছিল। স্থাপত্য বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। প্রাসাদ, রাজপথ, সেতু প্রভৃতি দিয়ে রাজধানীর শোভাবৃদ্ধি করেন। জাসটিনিয়ানের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি হল আইন সংস্কার ও সংবিধান সংশোধন।

তিনি সীজার ও অগাস্টিনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর প্রধান সেনাপতি বেলিসারিয়াস। বেলিসারিয়াস ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি। পারসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে, আফরিকার খ্রীষ্টান বিরোধীদের দমনে, কনস্তান্তিনোপলে দাঙ্গার সময় বেলিসারিয়াস অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখান। ভেনডালদের পরাজিত করে তিনি স্পেন অধিকার করেন। গথদের পরাজিত করে অধিকার করেন সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালীর অংশ।



জাসটিনিয়ান

পারসিয়ার সঙ্গে অনেকদিন ধরে সংগ্রাম চলে। এখানে বেলিসারিয়াস বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। বেলিসারিয়াসের শেষ জীবন কাটে অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে। কথিত আছে তাঁর জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে সম্রাট জাসটিনিয়ান বেলিসারিয়াসকে বন্দী করেন এবং একটি চোখ অন্ধ করে দেন। শেষ বয়সে বেলিসারিয়াসকে শহরের পথে পথে ভিক্ষা করে খেতে হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের ইউরোপের অংশ উদ্ধার করে পূর্ব-পশ্চিম মিলিয়ে সাম্রাজ্য গঠন ও তাতে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রসারের যে আদর্শ তাঁর মনে ছিল শেষ পর্যন্ত জাসটিনিয়ান তা সফল করতে পারেন নি।

জাসটিনিয়ান বিধান : জাসটিনিয়ানের অমর কীর্তি দেশের আইন সংস্কার করা ও নতুন বিধান প্রচলন করা। রোম সম্রাটরা দেশে অনেক আইন-কানুন তৈরি করেছিলেন। রোমের মত বাইজানটাইন সাম্রাজ্যেও এই সকল বিধান সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। পুরানো দিনের অনেক আইন-কানুন অচল হয়ে যায়। পুরাতন সংবিধান সংস্কারে হাত দেন। এর জন্য তিনি দশ জন বিশিষ্ট বিচারককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি প্রচলিত অপ্রচলিত সমস্ত বিধি একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করে। এরপর জাসটিনিয়ান তাঁর নতুন আইন প্রণয়ন করেন। পুরানো দিনের ভাল আইন তাঁর নতুন বিধানে স্থান পায়। অপ্রচলিত অপ্রযোজ্য আইন বাদ দেন। তাঁর নতুন আইন পুস্তকে খ্রীষ্টধর্মের ন্যায়নীতির আদর্শ গৃহীত হয়। আইনে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় জাসটিনিয়ানের বিধানে আছে। বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধান, আইন-কানুন জাসটিনিয়ানের বিধান ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। আইন প্রণয়ন করে জাসটিনিয়ান 'সভ্য সমাজের আইন প্রণেতা' উপাধি পান।

ব্যবসা-বাণিজ্যে কনস্তান্তিনোপলের গুরুত্ব : কনস্তান্তিনোপল ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বড় কেন্দ্র ছিল। অতি প্রাচীনকাল হতেই এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে যে পথে বাণিজ্য চলত শহরটি ছিল সেই পথের ওপর। বাণিজ্যের গুরুত্ব হিসাবে এই জায়গাটির বৈশিষ্ট্য গ্রীকরা উপলব্ধি করেছিল। তাই গ্রীক ব্যাপারীরা বাইজানটাইন শহরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। কালক্রমে কনস্তান্তিনোপল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বড় বাজার হয়ে ওঠে। এখানকার শিল্পীরা খুব দক্ষ ছিল। বাইজানটাইনের সোনা রূপার কাজ, হাতির দাঁতের কাজ, বয়ন শিল্প ছিল খুব উন্নতমানের। ইথিওপিয়া, ভারত, সিংহল, রাশিয়া, চীনের সাথে বাইজানটাইনের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। নানা রকমের বিলাস দ্রব্য আমদানী করা হত। মোম, মধু, লোমসমেত পশুচর্ম আসত রাশিয়া থেকে। ভারত আর সিংহল থেকে যেত মূল্যবান মণি-মুক্তো। চীন থেকে আসত রেশম। রেশম বা সিল্ক তখন একমাত্র চীন তৈরি করতে জানত। দু'জন সাধু পরিব্রাজক চীন থেকে গোপনে কিছু রেশম

গুটি এনে বাইজানটাইনে চাষ করে। ইউরোপের মানুষ এইভাবে রেশম তৈরি করতে শেখে। ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে এখানকার মানুষের আর্থিক উন্নতি হয়। এখানকার সাধারণ মানুষও সোনা-রূপার অলঙ্কার পরত। দামী রেশম কাপড় পরত।

বাইজানটাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি: রাজধানী কনস্তান্তিনোপল সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে সে যুগের শ্রেষ্ঠ শহর ছিল। মারবেল পাথরের বড় বড় প্রাসাদ, বিশাল অট্টালিকা, কারুকার্যখচিত গীর্জায় শহরটি সাজান ছিল। সম্রাটরা ছিলেন আড়ম্বর প্রিয়। প্রাসাদে উৎসব-আনন্দ লেগেই থাকত। দামী রেশম আর সোনার জরির তৈরি জামা-কাপড় তাঁরা পরতেন। প্রাসাদের দেয়াল, ছাদ, মোজাইকের চিত্র দিয়ে সাজান ছিল। প্রাসাদের ঐশ্বর্যের মধ্যে ছিল সোনার তৈরি কয়েকটি সিংহ। এমন কৌশলে এগুলি বানান হয়েছিল যে এগুলি গর্জন করতে পারত। একটি সোনার গাছ ছিল। তাতে ফল-ফুল ছিল মণি-মুক্তার। বাইজানটাইন শিল্পীরা ছিল খুব দক্ষ। স্থাপত্য শিল্পে তাদের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাদের তৈরি সেন্ট সোফিয়া গীর্জাটি তাদের উচ্চ শিল্প জ্ঞানের নিদর্শন। সম্রাট জাসটিনিয়ান এটি নির্মাণ করেন। দশ হাজার শ্রমিক পাঁচ বছরে এটি তৈরি করে। মুসলমান আমলে গীর্জাটিকে মসজিদে পরিণত করা হয়। টুকরো টুকরো নানা রঙের পাথর আর কাচ বসিয়ে শিল্পীরা গীর্জায়, প্রাসাদের দেওয়ালে, ছাদে, মেঝেতে অনেক রকমের ছবি তৈরি করত। এরকম কাজকে বলা হয় 'মোজাইক'। মোজাইকের কাজ বাইজানটাইন প্রথম শুরু করে।

এ দেশের সম্রাটের ক্ষমতা ছিল অসীম। প্রশাসনের জন্য সম্রাটরা দক্ষ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করতেন। দেশ রক্ষার জন্য ছিল বহু সৈন্য ও রণপোত। এখানকার বিজ্ঞানীরা একরকম অস্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে শত্রুর উপর তরল আগুন ছুঁড়ে মারত। শত্রুরা আগুনে পুড়ে মরত। এই অস্ত্রের নাম ছিল 'গ্রীক অগ্নি'।

বাইজানটাইনের সভ্যতা ছিল মূলতঃ গ্রীক সভ্যতা। এখানকার ধর্মেও গ্রীক খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব ছিল। গ্রীক খ্রীষ্টান ধর্ম আর রোমের খ্রীষ্টান ধর্মের ভিতর আচার-গত পার্থক্য আছে। গ্রীক আচার ব্যবহার শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এখানে খুব মর্যাদা পায়। এখানকার পণ্ডিতরা প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, দর্শন পড়াশুনা করতেন।

পড়াশুনা করার জন্য বাইজানটাইনে বিদ্যালয় ছিল। এই আমলে বাইজানটাইনে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা ছিল ধর্ম বিষয়ক। রাজাদের কীর্তি কাহিনী এই সমস্ত সাহিত্যে পাওয়া যায়। পুরানো বই-পত্র নকল করে সুন্দরভাবে লিখে রাখতেন। বর্বর জাতি গ্রীস অধিকার করার পর প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞান ভাণ্ডার নিয়ে পণ্ডিতরা কনস্তান্তিনোপলে পালিয়ে এসেছিলেন। কনস্তান্তিনোপলের পতনের পর বই-পত্র নিয়ে এখানকার পণ্ডিতরা চলে যান ইটালীতে। তাদের ইটালী যাওয়ার পর আরম্ভ হয় ইউরোপের নব যুগ বা রেনেসাঁস।

অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন ঃ**

(ক) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কি ছিল? এই নগরীর বর্ণনা দাও। (খ) জাসটিনিয়ানের বিধান বলতে কি বোঝ? এই বিধানের গুরুত্ব আলোচনা কর। (গ) জাসটিনিয়ানের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর। (ঘ) বাইজানটাইন সভ্যতার মূল বিষয়গুলি আলোচনা কর।

২। **সঠিক উত্তরটি বেছে দাও ঃ**

(ক) সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারকরেন/খ্রীষ্টধর্মের বিরোধিতাকরেন।

(খ) সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন/জাসটিনিয়ান 'মিলান অনুজ্ঞা' ঘোষণা করেন।

(গ) জাসটিনিয়ান সঙ্গীতের অনুরাগী/বিরোধী ছিলেন।

(ঘ) জাসটিনিয়ান সেনাপতি বেলিসারিয়াসকে বন্দী করেন, কারণ ঃ—তাঁর জনপ্রিয়তাকে সম্রাট ভয় পেতেন/তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

৩। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**

(১) কনস্তান্তিনোপলের আদি নাম কি? (২) বাইজানটাইনের প্রথম সম্রাটের নাম কি? (৩) জাসটিনিয়ানের সেনাপতি কে ছিলেন? (৪) সেন্ট সোফিয়া গীর্জা কে নির্মাণ করেন? (৫) সোনার গাছে মুক্তার ফল, কোন্ রাজার দরবারে ছিল?

৪। **শূন্যস্থানে ইতিহাস সম্মত কথা বসাও ঃ**

(ক) সেন্ট সোফিয়া গির্জা নির্মিত হয়··· (খ) কনস্টানটাইন প্রথমে ছিলেন···(গ)···সম্রাট প্রথম খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। (ঘ) জাসটিনিয়ান ···বৎসর রাজত্ব করেন। (ঙ) ···ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র ছিল।

পঞ্চম অধ্যায় | ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব

১। আরব দেশ—মানুষের জীবন যাত্রা ঃ ২। মহম্মদ ও তাঁর বাণী ঃ
৩। ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণ ঃ ৪। খলিফা—আরব সাম্রাজ্য ঃ
৫। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আরবের অবদান ঃ

আরব দেশ—মানুষের জীবনযাত্রা ঃ মধ্যযুগের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব। ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন মহম্মদ। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ সত্তর বছর পরে আরব দেশে মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

আরব দেশ মরুভূমির দেশ। এখানে না আছে গাছপালা না আছে নদীনালা। মহম্মদের সময় আরব দেশ তেমন সভ্য ছিল না, শিক্ষা সংস্কৃতি কিছু ছিল না। মরুভূমির ধারে ধারে ছিল গুটি কয়েক শহর। এই সমস্ত শহরে বাস করত কেবল বিত্তবান ব্যক্তিরা। বেশিরভাগ মানুষ বাস করত মরুভূমিতে—মরূদ্যানের কাছাকাছি জায়গায়। এদের নাম বেদুইন। এদের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশু পালন। ডাকাতি লুঠতরাজও তারা করত। মরুভূমির মানুষদের ভিতর ছিল নানা দল উপদল। দল উপদলগুলিকে বলা হয় কৌম। তাদের মধ্যে মারামারি খুন খারাপি হামেশাই চলত। প্রত্যেকটি কৌমের একজন করে প্রধান ব্যক্তি ছিল। তাকে বলা হত শেখ।

আরবের মানুষদের ভিতর নানা ধর্ম প্রচলিত ছিল, অসংখ্য দেব-দেবী ছিল। দেবদেবীর মূর্তি ছিল। গাছ পাথরও তাদের পুজো পেত। দেবতাদের নাম ছিল আল্লা, হুবল, মনত্ ইত্যাদি। আল্লা ছিলেন সকলের বড়। মক্কা শহর আরবের লোকদের তীর্থক্ষেত্র। মক্কার কাবা মন্দিরও ছিল পীঠস্থান। এই মন্দিরের ভিতর কালো রং-এর একখানা বড় পাথর আছে। এই পাথরখানাকে সকলেই পবিত্র মনে করত, পুজো করত। এই মন্দিরে প্রায় শ'চারেক অন্য দেবদেবীও ছিলেন। কাবা মন্দিরটির দেখাশুনা করত কোরেশ বংশের লোকেরা। মহম্মদ এই কোরেশ বংশের সন্তান।

মহম্মদ ও তাঁর বাণী ঃ মহম্মদের বাবার নাম আবদুল্লা, মার নাম আমিনা। মহম্মদের জন্মের আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ছয় বৎসর বয়সে তিনি মাকেও হারান। এক কাকা তাঁকে মানুষ করেন।

কাকা ছিলেন ব্যবসায়ী। অনেক উট আর ভেড়ার মালিক। মহম্মদ কাকার বাড়িতে উট, ভেড়া চরাতেন। লেখাপড়া করার সুযোগ তিনি পাননি। আর একটু বড় হয়ে উট ভেড়ার পিঠে মালপত্র বোঝাই করে তিনিও কাকার সাথে দূর দূর দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। এর ফলে নানা দেশের মানুষের সাথে তাঁর পরিচয় হল। তিনি ইহুদি ও খ্রীষ্টান ধর্মের তত্ত্ব জানলেন। নতুন ধর্মমতের সংস্পর্শে এসে আরব দেশের মূর্তি পূজা প্রভৃতি তাঁর নিকট অসার মনে হল। আরবদের কুসংস্কার দূর করার কথা তিনি ভাবতে লাগলেন।

বড় হয়ে তিনি খাদিজা নামে এক মহিলার কাছে চাকরি নিলেন। ইনিও ছিলেন ব্যবসায়ী। মহম্মদ ছিলেন খুব সৎ ও বিশ্বাসী। তাঁর কাজে খাদিজার খুব লাভ হতে থাকে। কিছুকাল পরে তিনি খাদিজাকে বিয়ে করলেন। খাদিজা মহম্মদের চাইতে পনের বছরের বড় ছিলেন। তাঁদের একটি কন্যা হয়। তাঁর নাম ফতিমা। এরপর তিনি সম্পূর্ণভাবে ধর্মচিন্তায় মন দেন। মক্কার নিকটে এক নির্জন গুহায় কয়েক বছর তিনি ধর্মচিন্তায় মগ্ন রইলেন। একদিন তিনি যেন হঠাৎ শুনতে পেলেন আল্লা তাঁকে ধর্মপ্রচারের আদেশ দিচ্ছেন। পর পর কয়েকদিন তিনি একই রূপ দৈববাণী শুনলেন। এরপর তিনি আল্লার বাণী প্রচারের জন্য বের হলেন। এখন হতে তিনি হলেন ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বা পয়গম্বর।

ইসলাম ধর্ম প্রসারের কারণ ঃ মক্কায় প্রথম মহম্মদ তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। গোড়ার দিকে মানুষ তাঁর নতুন ধর্মের কথা শুনে তাঁকে বিদ্রূপ করত। প্রথম তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করলেন তাঁর স্ত্রী। তারপর করলেন জামাতা আলি, বন্ধু আবুবকর এবং মক্কার অন্যতম বিশেষ ব্যক্তি ওমর। কোরেশ বংশের মানুষেরা কিন্তু মহম্মদের বিরোধী ছিল। তারা মহম্মদ এবং তার অনুগামীদের উপর নানা অত্যাচার শুরু করে, মহম্মদের জীবন নাশেরও চেষ্টা করে। মহম্মদ মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান (৬২২খ্রীঃ)। মহম্মদ যে ধর্ম প্রচার করলেন তার নাম ইসলাম ধর্ম। এই ধর্মের অনুগামীরা ও বিশ্বাসীরা মুসলমান নামে পরিচিত হলেন।

মদিনার মানুষ তাঁর ধর্ম গ্রহণ করল। সেখানে উপসনার জন্য বড় মসজিদ নির্মাণ করা হল। ক্রমেই তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। মদিনায় আসার আট বছর পরে তিনি চৌদ্দশত শিষ্য

সঙ্গে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কার মানুষদের সাথে তাঁর যুদ্ধ আরম্ভ হল। দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলে। শেষে তিনি জয়ী হয়ে কাবা মন্দিরে প্রবেশ করে সেখানকার সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে ফেললেন। তিনি ঘোষণা করলেন ঈশ্বর মাত্র একজন। তাঁর নাম আল্লা।

মহম্মদ মক্কার শাসনভার নিলেন। এরপর তিনি দেশে দেশে দূত পাঠিয়ে তাঁর ধর্ম প্রচার করতে সচেষ্ট হন। বাষট্টি বছর বয়সে মহম্মদের মৃত্যু হয়।

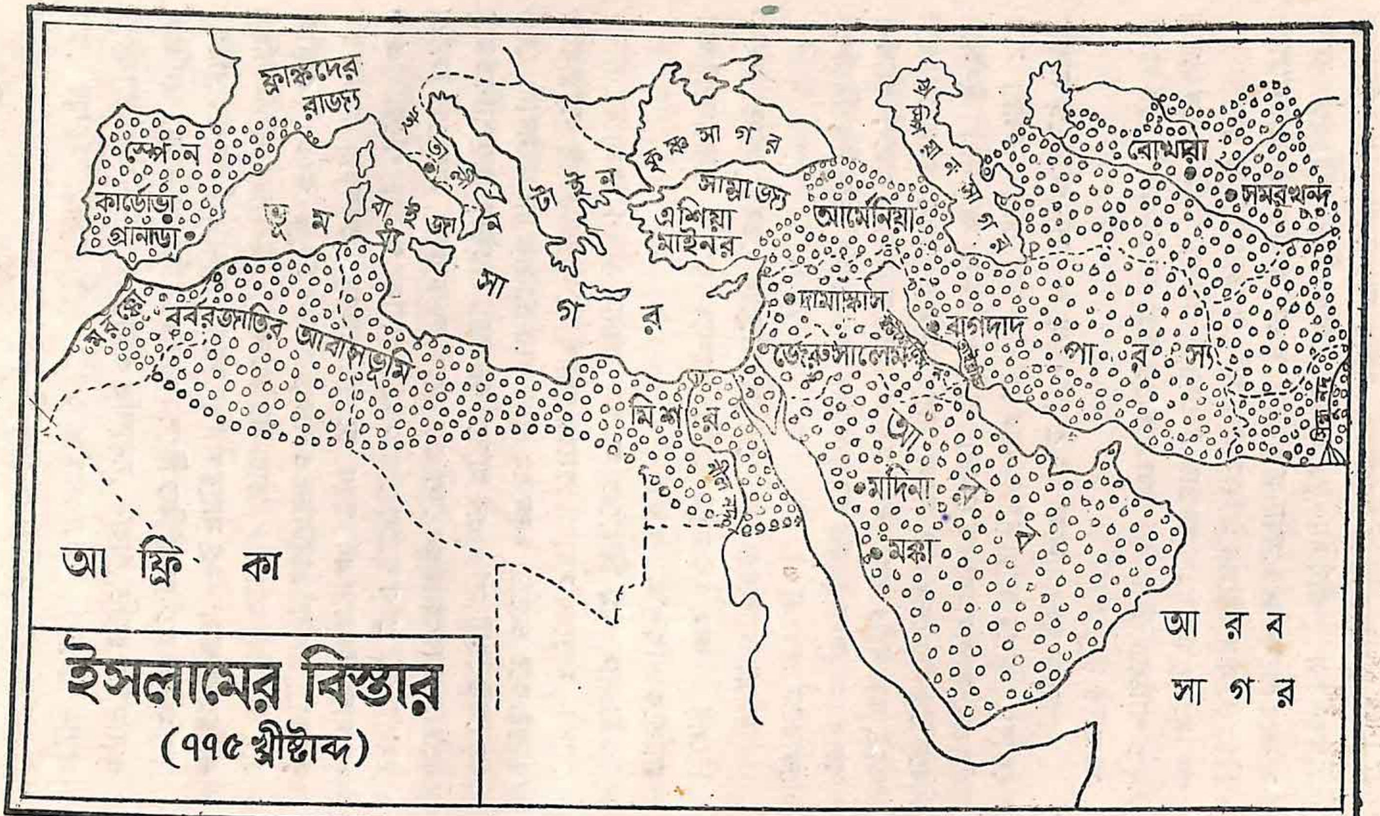
কোরান মুসলমানদের ধর্ম গ্রন্থ। মহম্মদের বাণী এই গ্রন্থে আছে। কোরানে আছে আল্লা ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই। আল্লা মাত্র একজন, মুসলমানরা বহু দেবতার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না। ইসলাম ধর্মে উঁচু-নীচু ভেদ নেই, সকল মানুষ সমান। সকল মুসলমান ভাই ভাই, ধনী গরীব সকলেই একসঙ্গে মসজিদে নমাজ পড়বে, প্রার্থনা করবে। মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নির্দেশও কোরানে লেখা আছে।

মহম্মদ আরবের নানা গোষ্ঠীর মানুষের ভেতর একতা এনেছিলেন। ফলে এক নতুন জাতি জন্মলাভ করে। ইসলাম ধর্ম এই জাতিকে শক্তিশালী করে।

ইসলাম ধর্ম বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ ইসলামের সাম্যবোধ। মানুষের সমানাধিকারের আদর্শ বহু মানুষকে এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে ও তারা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। সব মানুষ সমান, কেউ বড় কেউ ছোট নয়। এই আদর্শে আরবরা, বেদুইনরা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। আরবরা নতুন দেশ জয় করে সেখানকার মানুষদের বলতো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তারা সমান সুযোগ সুবিধা পাবে। এতে বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাছাড়া তখনকার দিনের দুটি বড় সাম্রাজ্য বাইজানটাইন ও পারস্য অনবরত যুদ্ধ করত। প্রজারা হয়ে উঠেছিল অতিষ্ঠ। তারা শান্তি চাইত। ইসলাম ধর্ম এনেছিল শান্তির আশ্বাস। বহু মানুষ শান্তির আশায় নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

মহম্মদ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি ছিলেন ধর্মগুরু, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি ও রাষ্ট্র প্রধান। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ছিল একমাত্র কন্যা। মৃত্যুর আগে মহম্মদ কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি।

তাঁর মৃত্যুর পর আরবের প্রধানরা বৃদ্ধ আবুবকরকে খলিফা বা



ইসলামের বিস্তার
(৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)

ইসলামের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে। খলিফারা একাধারে ইসলাম ধর্মের গুরু ও রাজনীতিক নেতা ছিলেন। আবুবকরের সময় হতে খলিফাদের যুগ আরম্ভ হয়। খলিফাদের যুগে নবগঠিত আরব জাতি সিরিয়া, প্যালেসটাইন, পারস্য, মিশর সমেত সমগ্র উত্তর আফরিকা, স্পেন জয় করে। এক সময় মনে হয়েছিল তারা সমগ্র ইউরোপ অধিকার করবে। কিন্তু স্পেন ও ফ্রানসের সীমানায় টুরস্‌-এর যুদ্ধে তারা ফ্রাংক নেতা চার্লস মারটেলের হাতে পরাজিত হয়। এর পর আরবরা ইউরোপ জয়ের আর কোন চেষ্টা করেনি। এই সময় আরবরা ভারতে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত অধিকার করে। মহম্মদের মৃত্যুর একশ' বছরের ভিতর তারা এক বিশাল ইসলাম সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

খলিফা—আরব সাম্রাজ্য ঃ আবুবকরের পর খলিফা হলেন ওমর। খলিফাদের মধ্যে তিনি হলেন সবচাইতে উদ্যমী, সাহসী ও চতুর। তাঁর আমলেই সিরিয়া, পারস্য, এশিয়া মাইনর, প্যালেসটাইন, মিশর জয় করা হয়। ওমর আততায়ীর হাতে নিহত হন। পরের খলিফার নাম ওসমান। তিনিও রাজ্য জয় এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর আমলে মক্কা ও মদিনার মুসলমান সমাজে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এর ফলে ইসলাম রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। ওসমানও শত্রুর হাতে নিহত হন। এরপর খলিফার পদে বসেন মহম্মদের জামাতা আলি। তিনি নানা বিষয়ে গুণী ছিলেন। অল্প দিনই তিনি রাজত্ব করেছিলেন। তিনি নমাজ পড়ার সময় নিহত হন। আলির মৃত্যুর পর সিরিয়ার গভরনর মুথাইয়া খলিফা নির্বাচিত হলেন, তিনিই শেষ নির্বাচিত খলিফা। এরপর হতে খলিফা পদ বংশগত হয়। পরের খলিফার নাম এজিদ।

মহম্মদের মেয়ের দুটি ছেলে। একজনের নাম হুসেন আর অপর জনের নাম হাসান। তাদের বাবা আলি খলিফা ছিলেন। তার ছেলেরাও খলিফা হতে চাইলেন। একদল লোক তাদের সমর্থন করল। এজিদের দলের লোকেরা হাসানকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। হুসেন ব্যাপার বুঝতে পেরে মক্কা ছেড়ে কুফায় চলে গেল। সেখানে তার সমর্থকরা ছিল। কুফার গভরনর কিন্তু ছিল এজিদের দলে। সে সৈন্য সামন্ত নিয়ে হুসেনকে কারবালার ময়দানে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

মুসলমানদের ভিতর সিয়া ও সুন্নি দুটি দল আছে। হুসেন হাসানের পক্ষের লোকেরা সিয়া, বাকিরা সুন্নি।

৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাস হলেন খলিফা। তিনি সিয়া সম্প্রদায়ের সমর্থক। খলিফা হয়েই তিনি এজিদের রাজধানী দামাস্কাস ধ্বংস করলেন। বাগদাদে নতুন শহর নির্মান করলেন এবং সেখানে রাজধানী করলেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন হারুন-অল-রসিদ। বাগদাদ এবং হারুন-অল-রসিদের নানা গল্প তোমরা অন্যত্র পড়েছ।

শিক্ষা সংস্কৃতি—আরবের অবদান: আরবরা দেশ জয় করেই সন্তুষ্ট থাকত না। শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন নিত। তাদের আমলে স্পেন দেশের বিশেষ উন্নতি হয়। ভিসিগথদের হারিয়ে আরবরা স্পেন অধিকার করে। আরব, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি নানা দেশ হতে মুসলমানরা এসে এদেশে বাস করতে থাকে। বিভিন্ন জাতির এই মানুষদের এক কথায় বলা হত মুর। স্পেনকে তারা ইউরোপের সেরা দেশ হিসেবে গড়ে তোলে। সুন্দর সুন্দর অনেক নতুন শহর গড়ে ওঠে। কারডোভা, গ্রানাডা টোলেডো শহরগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ। দেশের সর্বত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বড় বড় প্রতিটি শহরে খোলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়। কারডোভা, সেভিল, লিসবন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়। সকল ধর্মের ছাত্রই এখানে পড়াশুনা করতে পারত। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের সাথে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য পড়ান হত।

আরব পণ্ডিতদের মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত ছিলেন ইবনসিনা বা আভেসিনা। ধর্মে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান। তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতি বই লেখেন। ওষুধপত্র এবং সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাঁর বই আছে। ইবন খালদান নামে একজন পণ্ডিত ইতিহাসের বই লেখেন। আর একজন ইতিহাস লেখকের নাম আল-টাবারি। সব চাইতে বড় দার্শনিক ছিলেন ইবন-রশিদ। তিনি এরিস্টলের মূল গ্রীক দর্শন অনুবাদ করেন ও তার উপর টীকা লেখেন। অন্যান্য যারা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে আছেন অলবারুনী, ইবনবতুতা প্রভৃতি। এরা দু'জনেই ভারতে এসেছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন।

নানান জাতি ও দেশের সংস্পর্শে এসে আরবরা অনেক বিদ্যা শিখেছিল। নিজেরা চর্চা করে তাকে তারা আরও উন্নত করে। রসায়ন

শাস্ত্র তাদের আবিষ্কার। বীজগণিতকে বলা হয় অ্যালজাবরা। অ্যালজাবরা কথাটি আরবি। অ্যালজাবরা আরবেরই আবিষ্কার। ভূগোল ও চিকিৎসা বিজ্ঞানেও তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য।

কারডোভা : এক সময় কারডোভা ছিল স্পেনের রাজধানী। আমীর বংশের শাসনের সময় এর ঐশ্বর্যের ও আড়ম্বরের তুলনা ছিল না। শহরটিতে অসংখ্য অট্টালিকা ও পুস্তকাগার ছিল। উচ্চ এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শহরে বহু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এক সময় কারডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল সারা ইউরোপে।

ইউরোপে আরবদের প্রভাব : শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরব সে সময় সভ্যসমাজের শীর্ষে ছিল। ইতিহাসে আরবদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আরব সভ্যতা গ্রীক, ইরানী, ইহুদী, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির দানে সমৃদ্ধ। গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, ভেষজ, রসায়ন, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে এক সময় আরব পণ্ডিতরা ইউরোপে গুরুর স্থান অধিকার করেছিলেন। আভেসিনা ও আভেরোসার কথা বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা বিস্মৃত হননি। আজ ইউরোপে যা আরবী সংখ্যা বলে পরিচিত তা আরবের মানুষ ভারত থেকে নিয়ে ইউরোপকে জানিয়েছে। প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের বই আরবরা অনুবাদ করেছিল বলেই তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। চীনের কাছ থেকে কাগজ তৈরীর কৌশল শিখে নিয়ে আরবরা তা ইউরোপে প্রচলন করে।

অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(অ) মহম্মদের সময় আরবের অবস্থা কিরূপ ছিল? (আ) সংক্ষেপে মহম্মদের জীবন আলোচনা কর। (ই) আরব সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্বন্ধে যা জান লিখ। (ঈ) শিক্ষা সংস্কৃতিতে আরবের অবদান নির্ণয় কর।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) খলিফা কথার অর্থ কি? (খ) প্রথম খলিফা কে ছিলেন? (গ) সাম্রাজ্য বিস্তার কোন্ খলিফার আমলে বেশি হয়? (ঘ) কাদের 'সিয়া' এবং কাদের 'সুন্নি' বলা হত? (ঙ) আরবের পণ্ডিতদের ভিতর সবচাইতে বিখ্যাত ছিলেন কে? (চ) 'কৌম' কাদের বলা হত?

৩। **টীকা লিখ :**

কারবালা ; এজিদ ; কারডোভা ; ইবন খালদান ; ইবন রশিদ।

৪। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) মহম্মদের সময়ে আরবদেশে···কিছু ছিল না। (খ) বিত্তবানেরা বাস করত···। (গ) গরীবরা অধিকাংশ বাস করত···। (ঘ) দল উপদলগুলোকে বলা হত···। (ঙ) মক্কার···মন্দিরটি ছিল পীঠস্থান।

৫। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) মহম্মদ মদিনায় প্রথম তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন।
(খ) কোরেশ বংশীয় লোকেরা মহম্মদের বিরোধী ছিল।
(গ) মহম্মদ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান।
(ঘ) ইবনসিনা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

৬। সময় অনুযায়ী খলিফাদের নাম সাজিয়ে দাও :

আব্বাস, ওমর, আলি, আবুবকর।

ষষ্ঠ অধ্যায় | মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ

(৮০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)

১। শার্লমান—রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন : ২। সম্রাটের অভিষেক—অভিষেকের তাৎপর্য : ৩। রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক : ৪। শিক্ষার উন্নতি—মোনাসটারী—জীবনধারা : ৫। শিক্ষা বিস্তারে মোনাসটারীর অবদান : ৬। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান : ৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম—ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক :

শার্লমান—রোমান সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন : জার্মান হতে ফ্রাংক্স্‌রা এসে কিভাবে গলদেশ অধিকার করেছিল সে কাহিনী তোমরা পড়েছ। ফ্রাংক্স্‌রা দেশের নতুন নাম রাখল ফ্রান্স। তখনকার দিনে ফ্রান্স অনেক বড় ছিল। দক্ষিণ এবং পশ্চিম জার্মানির অনেক জায়গা এর ভিতর ছিল।

সে সময়ের ফ্রান্সের রাজা ছিলেন একটু আরাম প্রিয়। মন্ত্রীরা, বড় বড় রাজকর্মচারীরা রাজার নামে দেশ শাসন করত। রাজকর্মচারীদের ভিতর পেপিন নামে একজন বিচক্ষণ লোক ছিল। সে রাজপ্রাসাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তার উপাধি ছিল মেয়র অব দ্য প্যালেস। রাজার হয়ে সমস্ত কাজকর্ম সে চালাত। রাজার মতই ছিল তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। সিংহাসনে অনায়াসেই সে বসতে পারত, কিন্তু বসেনি।

তার ছেলের নামও ছিল পেপিন। লোকে তাকে বলত পেপিন দি শর্ট বা বেঁটে পেপিন। বেঁটে পেপিন ছিল উচ্চাকাঙ্খী। অকর্মণ্য রাজাকে সরিয়ে সে সিংহাসন দখল করতে চাইল। এ কাজে তার কিছু নৈতিক সমর্থকের দরকার হল। সে গেল ধর্মগুরু পোপের কাছে। পোপকে সব খুলে বলল। পোপ তাকে সমর্থন করলেন এবং বললেন যার শক্তি আছে সিংহাসন তার প্রাপ্য। পোপ অবশ্য নিজের স্বার্থের জন্যই পেপিনকে সমর্থন করলেন। কেননা পোপ নিজেই এই সময় লমবারডদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। পেপিনকে দিয়ে লমবারডদের তিনি শায়েস্তা করতে মনস্থ করেছিলেন।

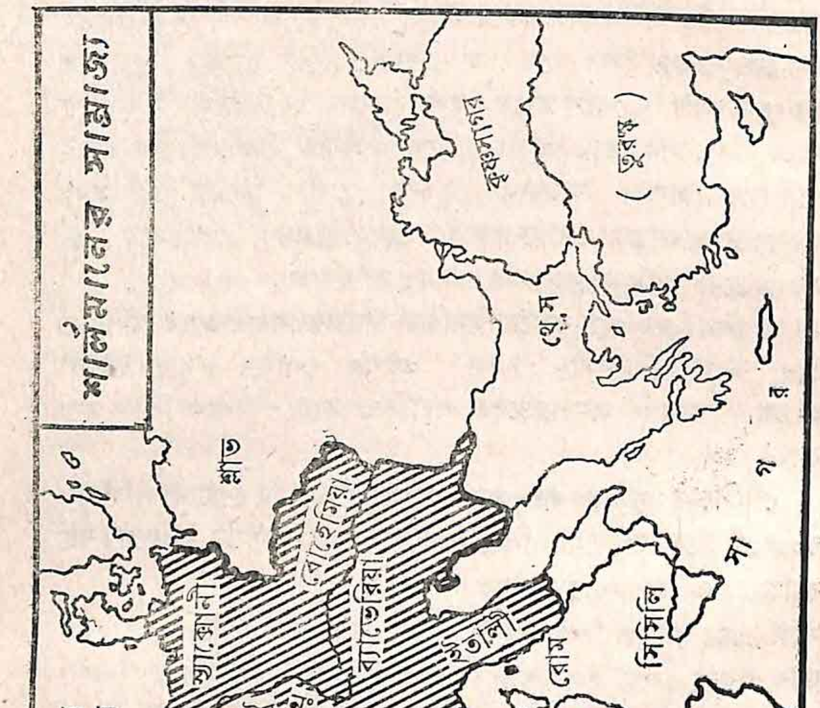
পেপিন ফিরে এসে ক্যারোলিনজিয়ম বংশের শেষ রাজাকে গদীচ্যুত করে নিজে সিংহাসনে বসল। এরপর পেপিন দু'বার ইটালী অভিযান করে। লমবারডদের পরাজিত করে পোপকে বিপদ মুক্ত করেন।

পেপিনের মৃত্যুর পর তার ছেলে চার্লস দি গ্রেট বা শার্লমান ৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রানসের সিংহাসনে বসেন। শার্লমান মধ্যযুগের বহু কাহিনী ও উপকথার নায়ক। শার্লমানের চেহারা ছিল বিরাট। তাঁর প্রকাণ্ড দেহে ছিল অসুরের বল। তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতেন। নিজের দেশের তৈরি পোষাক পরিচ্ছদ পরতেন। ভাল হলেও বিদেশী জিনিস তিনি ব্যবহার করতেন না। ভাল সাঁতার কাটতে পারতেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সরস হাস্যালাপ করতে ভালবাসতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শার্লমান ছিলেন ভয়ঙ্কর।


শার্লমান

সম্রাটের অভিষেক—অভিষেকের তাৎপর্য: ফ্রানসের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা শার্লমানের শাসন পছন্দ করত না, কিন্তু তিনি নানা কৌশলে তাদের বশে এনেছিলেন। লমবারড রাজা ডেসিডেরিয়ামকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। জার্মানির স্যাকসনরা উৎপাত করছিল।

তারা খ্রীষ্টধর্ম মানতে চাইছিল না। শার্লমান বিশবার তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ও শেষ পর্যন্ত তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে



বাধ্য করেন। তারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। জার্মানির অপর দেশ বেভেরিয়া হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তিনি পুনরায় তা অধিকার করেন। ফ্রান্স-স্পেনের সীমান্তের পিরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে

শার্লমান স্পেনের মুরদের আক্রমণ করেন। এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তাঁর ভাইপো মারা যায়। ফ্রান্স, অসট্রিয়া, ডেনমারক, হাঙ্গেরির কতক অংশ, যুগোশ্লাভিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, ইটালীর সমগ্র অঞ্চল শার্লমানের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মানচিত্র দেখলেই বুঝতে পারবে তাঁর রাজ্য কত বড় ছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের গুরু পোপকেও তিনি শত্রুর হাত হতে রক্ষা করেছিলেন।

রাজত্বের উনিশ বছর পরে আটশ খ্রীষ্টাব্দের বড় দিনের সময় যীশুর জন্মদিনে শার্লমান রোমের সেণ্ট পিটার গির্জায় প্রার্থনা করতে যান! চোখ বন্ধ করে, মাথা নীচু করে, হাঁটুগেড়ে বসে তিনি যীশুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছিলেন। এমন সময় পিছন দিক হতে চুপি চুপি এসে পোপ তৃতীয় লিও শার্লমানের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। পোপ শার্লমানকে রোমান সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। সাম্রাজ্যের নাম করা হল হোলি রোমান এমপায়ার—পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য।

৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শার্লমান রোমান সম্রাট হলেন। মানুষ ভাবল আবার পুরানো রোমান সাম্রাজ্য ফিরে এল। কার্যতঃ কিন্তু শার্লমান ছিলেন ফ্রান্সের রাজা। দেশ জয় করে রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করেছিলেন মাত্র। তাঁর সাম্রাজ্যকে বলা হত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। এটা না ছিল পবিত্র, না রোমান, না প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্য। তবুও এই পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হবার জন্য পরে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে ছিল।

রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক ঃ এইভাবে সম্রাট হওয়া শার্লমানের ভাল লাগল না। অন্ততঃ তাই তিনি মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মনে হল এতে পোপের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া হল। তাতে মানুষের ধারণা হল নিজে কিছু নয়; পোপ তাঁকে সম্রাট করেছেন।

পোপের হাতে রাজমুকুট পরার পরে অভিষেক প্রথায় দাঁড়ায়। রাজাদের পক্ষে মধ্যযুগে এটা অবশ্য করণীয় ছিল। পোপ অনুমোদন না করলে কেউ রাজা হতে পারত না। সকল রাজাকেই মাথা নীচু করে, হাঁটুগেড়ে পোপ বা তার প্রতিনিধির সামনে বসতে হত।

পোপ নিজের স্বার্থে শার্লমানকে সম্রাট করেছিলেন। খ্রীষ্টানদের ভিতর তখন নানা গোলমাল চলছিল, দেশে শান্তি ছিল না। নিজে শাসনভার নিয়ে অশান্তি দমন করা পোপের পক্ষে সম্ভব

ছিল না। তাই তিনি চাইছিলেন একজন শক্ত মানুষ যে তাঁর কথা মেনে তাঁর হয়ে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা আনতে পারবে। শার্লমানের মধ্যে তিনি মনের মত মানুষের সন্ধান পেয়েছিলেন। শার্লমান পোপের রাজ্য নিষ্কণ্টক করেছিলেন। ধর্ম প্রচারে পোপকে নানাভাবে সাহায্যও করেছিলেন।

শিক্ষার উন্নতি—মোনাসটারী—জীবন ধারা: ফ্রান্সের মানুষরা ধর্ম ও রাষ্ট্রকে একই ভাবত। ফ্রাংক্‌রা খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য তাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। খ্রীষ্ট ধর্ম তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সম্রাট শার্লমান ধর্ম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। তিনিও ভাবতেন ধর্মের জন্য রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ধর্ম। ধর্ম প্রচার করতে তিনি বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করতেন না। অনিচ্ছুক স্যাক্‌সন্‌দের যুদ্ধে হারিয়ে জোর করে ধরে এনে তিনি তাদের খ্রীষ্টান করেছিলেন। দেশের মানুষ যাতে ভাল ধর্ম শিক্ষা পায় তার জন্য তিনি নতুন নতুন ধর্মযাজক নিয়োগ করেছিলেন, মোনাসটারী খুলেছিলেন। শার্লমান আইলা শ্যাপেলে বিরাট একটি গির্জা তৈরি করেছিলেন। এটির নাম হোলি মাদার চার্চ।

শিক্ষাবিস্তারে মোনাসটারীর অবদান: শার্লমান নিজে লেখা-পড়া জানতেন না তবে গ্রীক, ল্যাটিন বুঝতেন। শিক্ষিত লোকদের শ্রদ্ধা করতেন। তাদের মুখে শিক্ষার কথা, জ্ঞানের কথা শুনতেন। তাঁর খাবার সময় একজন পণ্ডিত তাঁকে বই পড়ে শোনাতেন। দরবারে অনেক শিক্ষিত লোক রেখেছিলেন। এর ভিতর একজন ছিলেন ইংরেজ, নাম অলকুইন। অলকুইন শার্লমানের শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা ছিলেন। বিশপ প্রভৃতি ধর্মযাজকদের শেখাবার জন্য রাজপ্রাসাদে একটি স্কুল খোলা হয়। পরে অন্য লোকেও এখানে পড়তে আসত। তখন বই লেখা হত হাতে। পুরানো ছেঁড়া বইকে তিনি নতুন করে, সুন্দর করে লিখিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান: শার্লমান আটত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। বাগদাদের খলিফা হারুন-অল রসিদের দরবারে দূত পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রবর্তন করেছিলেন। শাসকদের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। দক্ষ ব্যক্তিদের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে তিনি প্রদেশে পাঠাতেন।

এদের নাম ছিল কাউনট। কাউনটরা কি রকম শাসন করছেন তা দেখবার জন্য সম্রাট প্রতি বছর দু'জন পরিদর্শক প্রতিনিধি পাঠাতেন। প্রতিনিধিরা জনসাধারণের বক্তব্য শুনতেন, তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য কাউনটদের পরামর্শ দিতেন। শার্লমান এক উন্নত শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। মধ্যযুগে তাঁর সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বড় ছিল। শার্লমানের রাজধানী ছিল আইলা শ্যাপেল শহরে। রাস্তাঘাটের উন্নতি করে, বড় বড় বাড়ি নির্মাণ করে তিনি এই শহরটিকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছিলেন।

৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শার্লমানের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে।

মোনাসটারীর কথা তৃতীয় পরিচ্ছেদে এক জায়গায় পড়েছ। সাধু সন্ন্যাসীরা যেখানে বাস করতেন তার নাম হ'ল মোনাসটারী বা আশ্রম। নির্জন আশ্রমে বসে সন্ন্যাসীরা সাধন ভজন করতেন, লেখাপড়া করতেন। মধ্যযুগের অন্ধকার আমলে মোনাসটারীর সাধু সন্তরা লেখাপড়া করে শিক্ষা-দীক্ষাকে সজীব রেখেছিলেন। সন্ন্যাসীদের বলা হত মংক। প্রথম দিকে কেবল পুরুষ সন্ন্যাসীরাই থাকত। পরবর্তীকালে আশ্রমে মহিলা সন্ন্যাসিনীরাও বাস করতে থাকেন। তাঁরা থাকতেন পৃথক মোনাসটারীতে। মহিলা সন্ন্যাসিনীদের বলা হয় নান। তাদের আশ্রমকে বলা হয় নানারি বা কনভেনট। আমাদের দেশেও অনেক কনভেনট আছে।


মোনাসটারী

আশ্রমবাসীরা খুব সাদা-সিধা জীবন-যাপন করতেন। কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হত তাদের। তারা কেউ বিয়ে করতে পারতেন না। ঘর-সংসার তাদের ছিল না। প্রার্থনা, উপাসনা, জনসেবা করে তাদের দিন কাটিত।

আশ্রমের সাধু সন্ন্যাসীরা বিদ্যাচর্চার ধারাকে অন্য আর একভাবেও রক্ষা করেছিলেন। তখনকার দিনে ছাপা বই ছিল না। বই লেখা হত হাতে। তাই বই-এর সংখ্যাও ছিল খুব কম। বই কম থাকায় কম মানুষ বই পড়তে পেত। হাতে লেখা বই বেশি নাড়াচাড়া করলে



মংক বা সন্ন্যাসী

তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেত। সাধুদের হাতে সময় ছিল। আশ্রমে বসে তারা পুরানো বই নকল করতেন। নতুন করে লিখতেন। গ্রীক, ল্যাটিন ভাষার বইও তারা লিখতেন। এরকম হাতে লেখা অনেক বই আশ্রম হতে পরে পাওয়া গিয়েছে।

মোনাসটারীগুলি ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে। তার খরচ-পত্র দিত বিত্তবানরা। হাতে পয়সা আসায় পরবর্তীকালের সাধুরা একটু আরামপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সেণ্ট বেনেডিক্ট-এর এটা ভাল লাগল না। তিনি আশ্রমের জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি নিয়ম করলেন। এতে সন্ন্যাসীদের আজীবন ব্রহ্মচারী থাকার, দারিদ্র্য বরণ করার আর আশ্রমের প্রতি অনুগত থাকার তিনটি শপথ নিতে হত। আশ্রমবাসী-দের দৈনন্দিন কাজের সময়ও তিনি বেঁধে দেন। সকালের চার ঘণ্টা সমবেত প্রার্থনা, স্তোত্রপাঠ, পরের ছয় সাত ঘণ্টা ক্ষেতখামারে শারীরিক শ্রমের কাজ ও পরের চার ঘণ্টা অধ্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। সেণ্ট বেনেডিক্ট নিজের আশ্রমের জন্য এই নিয়ম করেছিলেন। পরে সব আশ্রমেই এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়। এর পরও চার্চকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। তখন দেশের রাজারাই চার্চের কর্তা। রাজার

এবং রাষ্ট্রের হাত হতে চার্চ মুক্ত করতে, আভ্যন্তরীন দুর্নীতি দূর করতে, চার্চের সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা রদ করতে আন্দোলন চলতে থাকে।

ক্লুনী মঠ ঃ বাস্তবক্ষেত্রে বেনেডিক্ট-এর নিয়মগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব হল না। কারণ মঠগুলি ছিল নিজ নিজ এলাকায়। প্রত্যেক মঠের যাজকগণ নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি অনুসারে চলতেন। পোপেরও বিভিন্ন মঠে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা ছিল না। তাই সৎ যাজক সম্প্রদায় এই বিপদ থেকে চার্চগুলিকে উদ্ধার করার জন্য উইলিয়াম ডিউকের কাছে গেল। ডিউকের মধ্যস্থতায় ক্লুনী মঠে জমিদান নিষিদ্ধ হল। আর মঠ জীবনে অলসতা সর্বোতভাবে বর্জিত হল। তাছাড়া এই মঠের তত্বাবধানায় অন্যান্য মঠগুলিকে রাখা হল। অল্পদিনের মধ্যে এই ক্লুনী মঠে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি বিভিন্ন মঠগুলি অনুসরণ করতে লাগল।

ইনভেষ্টিচার ঃ ক্লুনী মঠের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেল যে ধর্মীয় বিষয়ে একজনের আদেশ মেনে চলাই ভাল। নচেৎ এরূপ সংঘাত বার বার ঘটতে থাকবে। রোমের পোপ নির্বাচন ধর্মীয় ব্যক্তিদের দ্বারাই হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হল। এজন্য বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাপারে পোপের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হল। এই ব্যবস্থার ফলে রাজশক্তির সঙ্গে ধর্মীয় শক্তির সংঘাত বাধল। যেমন পোপ গ্রেগরীর সঙ্গে জার্মানীর সম্রাট চতুর্থ হেনরীর বিরোধ বাধল বিশপ নিয়োগ নিয়ে, গ্রেগরী দাবী করলেন বিশপ নিয়োগ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়। কিন্তু একথা হেনরী মানতে চাইলেন না। চিরাচরিত প্রথায় তিনি বিশপ নিয়োগ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের এক আপস নিষ্পত্তি করা হয়। একেই বলে 'ইনভেষ্টিচার বিরোধ'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম—ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক ঃ মধ্যযুগে ইউরোপে লেখাপড়ার জন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। মানুষ ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন মূর্খ। লেখাপড়ার চর্চা করত শুধু মোনাসটারীর সাধু সন্ন্যাসীরা। পরে অবশ্য অনেক মোনাসটারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিলাতের অক্সফোরড বিশ্ববিদ্যালয় মোনাসটারী হতে হয়। আরবরা এই সময় ইউরোপের অনেক দেশ জয় করে। তারা ছিল শিক্ষিত। শিক্ষার সুফল তারা জানত। তাদের শাসনাধীন দেশে তারা স্কুল খোলে, বিশ্ববিদ্যালয় বানায়। আরব শাসনের সময় স্পেনের এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে স্কুল ছিল না। প্রতিটি বড় বড় শহরে তারা একটি

করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। স্পেনের কারডোভা সেভিল, লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত হয়।

ইউরোপের নানান দেশের ছেলেরা স্পেনের বিদ্যালয়ে পড়তে আসত। তাদের পড়াশুনা করতে হত আরবী ভাষায়। আরবের অধ্যাপকরা পড়াতেন। আরব পণ্ডিতরা গ্রীক ভাষায় লেখা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে নিত। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এইভাবে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং পরে ল্যাটিন ভাষা, ইউরোপের শিক্ষিত মানুষের ভাষা হয়।

পড়াশুনা শেষ করে ছেলেরা যে যার দেশে ফিরে যেত। দেশে ফিরে তারা শিক্ষক হত, শিক্ষা বিস্তারে মন দিত। স্কুল খুলে দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাত। তবে শেখানো হত ল্যাটিন ভাষায়।

একজন শিক্ষকের পক্ষে সকল বিষয় পড়ান সম্ভব হত না। কয়েকজন শিক্ষক মিলে ছাত্রদের পড়াতেন। শিক্ষকদের ছাত্র পড়াবার সমবেত সংস্থা ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে। এই রকম সংস্থা হতে পরে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ইউনিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'ইউনিভারসাম' থেকে। এর এক অর্থ বিশ্বজনীন, অপর অর্থ সমবেত।

ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ফ্রান্সের প্যারিসে, ইটালির বোলাগনায়, জার্মানির স্যাকসনিতে, ইংলণ্ডের অক্সফোরডের বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত হয়। কোন ধর্ম শাস্ত্র পড়ান হত না। শিক্ষার নানা বিষয় পড়াশুনা হত। আইন, ভেষজ, তর্কশাস্ত্র, দর্শন বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য সব বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় এক এক বিষয়ের জন্য নাম করে। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব ভাল পড়ান হত। সালোরানার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেষজ বিজ্ঞান ভাল পড়ান হত। বোলোগনায় পড়ান হত আইন।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করত ধর্মসংস্থা চার্চের কর্তৃপক্ষ। তার একজন শিক্ষাবিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান করত। তাকে বলা হত চ্যানসেলার। অন্যান্য অধ্যাপকদের তিনি নিযুক্ত করতেন। পড়াশোনার শেষে ছাত্ররা যাতে চার্চে যোগ দেয় অর্থাৎ ধর্মযাজক হয় তার দিকে বেশি নজর রাখা হত।

পড়াশোনা হত সব ল্যাটিন ভাষায়। ছাত্রদের মাতৃভাষা যাইহোক

তা তারা ক্লাসে বলতে পারত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার ভেতর বলতে পারত না। বলা-কওয়া সব করতে হত ল্যাটিন ভাষায়। সব সময় যাজকেদের মত কালো পোষাক পরতে হত।

এখন এক বিষয়ের অধ্যাপক ক্লাসে এসে একই ক্লাস নেন। তখন কিন্তু তা করা হত না। তখন ক্লাস নিতেন তিন-চারজন অধ্যাপক এক সঙ্গে। একজন উঁচুগলায় বই থেকে পড়ে যেতেন। অন্যরা দাঁড়িয়ে থাকতেন, শ্রেণীর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। যিনি পড়াতেন তিনি ব্যাখ্যা টীকাটিপ্পনীও করতেন, অন্য অধ্যাপকরাও তাতে যোগ দিতেন। তখন ছাত্রদের কোন বই ছিল না। ছাপা বই তখন হয়নি। হাতে লেখা বই ছিল দুষ্প্রাপ্য, ছাত্ররা তা কিনতে পারত না। তারা অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনে নিজেদের খাতায় লিখে নিত। পড়াশোনায় মুখস্ত বিদ্যার ওপর জোর দেওয়া হত।

ছাত্ররা খুব শান্ত শিষ্ট ছিল না। নিজেদের ভেতর তারা মারপিট খুবই করত। বাইরের লোকদের সঙ্গেও তাদের মারপিট হত। দাঙ্গার সময় সব ছাত্রই একদল হয়ে লড়ত। বাইরের কোন কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিচার করতে পারত না, সাজা দিতে পারত না। তাদের বিরুদ্ধে যা কিছু করার সব কিছুই করত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দেশের ছাত্র পড়াশোনা করত। শিক্ষক অধ্যাপকরাও নানা দেশ হতে আসতেন। এক দেশের ছাত্র শিক্ষক মিলে তারা সমিতি গঠন করত। একে বলা হত ন্যাশন। এরা হল পরবর্তী-কালের ছাত্র সমিতির পূর্ব পুরুষ।

ছাত্র অধ্যাপক সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার ভেতর বাস করত। অধ্যাপকরা ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানতেন। নানা ভাবে তাদের সাহায্য করতেন। ছাত্ররাও শিক্ষককে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। পিতাপুত্রের মত তাদের ভেতর মধুর সম্পর্ক ছিল।

এই যুগে বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফ্রান্সের এবেলারড ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। জার্মানির এলবার্ট ম্যাগনাম আর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত। দর্শনের অধ্যাপক হয়েও তিনি বিজ্ঞান ভালবাসতেন। কীটপতঙ্গের জীবন নিয়ে আলোচনা করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার লেখা বই আছে। ইটালির নেপলস শহরের টমাস একুইনাম একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। তিনিও দর্শনের ছাত্র ছিলেন। এরিসটটল ভাল করে পড়েছিলেন। অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে

তিনি বই লেখেন। ইংলণ্ডের রজার বেকন মধ্যযুগের নামকরা পণ্ডিত মানুষ। তিনি ভালবাসতেন বিজ্ঞান। তিনি নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য বলে দিতে পারতেন। তিনি বলেছিলেন মানুষ একদিন মোটর গাড়ি চড়বে, সমুদ্রে কলের জাহাজ চালাবে, আকাশে উড়বে। তখনকার দিনে এসব কথা বলা পাপ ছিল। তাই তাকে এজন্য চৌদ্দ বছর জেল খাটতে হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) শার্লমান কোথাকার রাজা ছিলেন? কিভাবে তিনি সম্রাট হয়েছিলেন?

(খ) শার্লমানের সাম্রাজ্যের বিবরণ লেখ।

(গ) শিক্ষাবিস্তারের জন্য শার্লমান কি করেছিলেন? শিক্ষাবিস্তারে মোনাসটারীর ভূমিকা কি ছিল?

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় কি করে গড়ে ওঠে? মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি রকম পড়াশুনা হত?

(ঙ) মোনাসটারীতে সাধু সন্ন্যাসীরা কিভাবে জীবন-যাপন করতেন?

২। **প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

(ক) শার্লমান কবে কোথায় কিভাবে সম্রাট হয়েছিলেন?

(খ) শার্লমানের সাম্রাজ্যের নাম কি ছিল? কে কি নাম দেন?

(গ) শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান কি? কারা অনুষ্ঠানে শপথ নিত?

(ঘ) এ্যাবি কাকে বলে? নান কাদের নাম?

(ঙ) ইউরোপে কারা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে? তিনটে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর?

৩। **টীকা লিখ :**

পেপিন, পবিত্র রোম সাম্রাজ্য, নানারি সেন্ট বেনেডিক্ট, কারডোভা, রজার বেকন।

৪। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) ফ্রান্সের রাজাদের বলা হত ক্যারোলিন্‌জিয়ন রাজা।

(খ) রাজা পেপিন উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ করেন।

(গ) শার্লমান লম্বার্ড-এর রাজা ডেসিডেরিয়ামের হাতে পরাজিত হন।

(ঘ) শার্লমান লেখাপড়া জানতেন না।

সপ্তম অধ্যায় | ক. সামন্ততন্ত্রের কথা

১। সামন্ততন্ত্র—সামন্তপ্রথা—জমির বন্ধন : ২। সামন্ত প্রতিষ্ঠান : ৩। দুর্গ-দুর্গের ভূমিকা—শিভ্যালরি : ৪। ত্রুবেদুর—চারণ কবিদল।

সামন্ততন্ত্র—সামন্তপ্রথা—জমির বন্ধন : পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হল পঞ্চম শতাব্দীতে। এর পরের তিনশ' বছর ধরে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে চলে চরম বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা। এই অরাজকতা দমন করে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার মত কোন শক্তিমান রাজা ছিল না। রোম সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে একতা ছিল না। সুযোগ সুবিধা মত এরা একে অপরকে আক্রমণ করত। শার্লমান সম্রাট হয়ে আটত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। ইউরোপে আবার অরাজকতা দেখা দেয়। হাঙ্গামাকারীরা আবার আক্রমণ শুরু করে, লুঠতরাজ করতে থাকে। উত্তর ইউরোপ হতে নরসম্যানরা দলে দলে এসে পশ্চিম ইউরোপের নানা জায়গায় হাঙ্গামা বাধায়, লুঠতরাজ অগ্নিসংযোগ করে শহর নগর বিধ্বস্ত করতে থাকে। পূর্ব দিক হতে আসে ম্যাগায়াররা। এরা থাকত পশ্চিম এশিয়ায়। এদের আক্রমণে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ছারখার হয়ে যায়। জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ম্যাগায়ারা আগের দিনের হূনদের মতই ছিল নিষ্ঠুর আর অত্যাচারী।

সমগ্র ইউরোপ জুড়েই চলছিল গোলমাল বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি। দেশে মানুষের জীবনে কোন শান্তি ছিল না, নিরাপত্তা ছিল না। এমন কোন শক্তিশালী রাজাও ছিল না যে অরাজকতা দমন করে প্রজাদের মনের ভয় দূর করতে পারে। ডাকাত, লুঠেরাদের আক্রমণে বিত্তবানরা, বড় জমিদাররা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারত। কিন্তু বিপদ হত গরীবদের, ছোট চাষীদের। লুঠেয়ারা তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিত, মারধর করত, জিনিসপত্র কেড়ে নিত। তাদের বাধা দেবার কেউ ছিল না।

এমন অরাজক রাজত্বে নিরাপত্তার আশায়, ধনপ্রাণ রক্ষার তাগিদে

ছোট চাষীরা কাছের কোনো বিত্তবান বড় মানুষ বা শক্তিমান জমিদারের শরণ নিতে লাগল। নিজেদের ক্ষেত খামার জায়গা জমি-সব শক্তিমানের হাতে তুলে দিল। সে তাদের ধনপ্রাণ রক্ষার প্রতি-শ্রুতি দিল। যার হাতে জমি গেল সে হল জায়গীরদার। জায়গীরদার নিজে জমি চাষ আবাদ করত না। সে চাষীদের জমি আবার চাষীদের ভেতর বিলি করে দিল। নতুন শর্ত হল চাষীরা ফসলের অংশ তাকে দেবে আর যুদ্ধের সময় তার সৈন্য হয়ে তাকে সাহায্য করবে। এই-ভাবে চাষীরা নিজেদের জমিতেই জমিদারের প্রজা হয়ে পড়ল। জমির বন্দোবস্ত নিয়ে জমিদার আর প্রজার ভেতর যে ব্যবস্থা গড়ে উঠল তাই হল সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বা জায়গীরদারী।

সামন্ত প্রতিষ্ঠান ঃ সামন্ততান্ত্রিক প্রথা পুরোপুরি গড়ে উঠেছিল জমি ভিত্তি করে। ইংরেজিতে সামন্ততন্ত্রকে বলা হয় ফিউড্যালিজম্। ফিউড্যাল এসেছে ফিউড শব্দ থেকে। এর অর্থ হল, কাজের শর্তে জমি অধিগ্রহণ অর্থাৎ চাকরান জমি। তখনকার দিনের আয়ের একমাত্র পথ ছিল জমি। জমির ফসল হতেই মানুষ উপার্জন করত। কাজেই যার যত বেশি জমি থাকত সে তত বেশি বড়লোক হত। প্রতিটি জমিদারের বহু চাষীপ্রজা থাকত। তারা যা ফসল ফলাত সবই যেত জমিদারের গোলাঘরে। পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত দেশেই সামন্তপ্রথা গড়ে ওঠে। দেশ বিদেশে নিয়মকানুনের কিছু কিছু তফাৎ থাকলেও এর মূল ভিত্তি সব দেশে একই রকম ছিল।

সামন্তপ্রথার প্রধান ছিলেন দেশের রাজা। রাজা ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। তিনি কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে জমি ভাগ করে দিতেন। এই প্রধানদের বলা হত লরড বা ডিউক। জমি অধিগ্রহণ করে ডিউকরা রাজার ভ্যাসেল বা অনুগত প্রজা হতেন। ভ্যাসেল হবার সময় এক অনুষ্ঠান হত। তাতে ভ্যাসেলকে রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হয়। আর যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য দিয়ে রাজাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিতে হত। ডিউকরা আবার জমি ভাগ করে দিতেন নিজেদের প্রধান ব্যারনদের মধ্যে। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিউক ও ব্যারনদের আনুগত্যের শপথ ও দরকার মত নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি আদায় করত। ডিউকরা নিজেরা জমি রাখত না। তারা জমি দিত তাদের নাইটদের। নাইটরাও অনুগত্যের শপথ করত আর সৈন্য যোগানের

প্রতিশ্রুতি দিত। এই রকম ব্যবস্থার ফলে রাজার ক্ষমতা সীমিত হল। তিনি সরাসরি ডিউকদের নীচের অর্থাৎ ব্যারনদের বা নাইটদের কাছে কিন্তু দায়ী করতে পারতেন না। তাঁকে নির্ভর করতে হত ডিউকদের ওপর। ডিউকরাও ব্যারনদের বাদ দিয়ে নাইটদের কিছু বলতে পারত না।

নাইটরা প্রভুত্ব করত চাষীদের ওপর। চাষীরাই উৎপাদন করত, ফসল ফলাত। তাদের ওপর পড়ত সমস্ত চাপ। চাষীদের বলা হত ভিলেন। ভূমিহীন চাষী, প্রান্তিক চাষীদের নাম হল সারফ।

ভ্যাসাল করা হত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে। একে বলা হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

তখনকার সমাজ ছিল ডিউক, ব্যারন, নাইটদের নিয়ে গঠিত। নাইটরা ব্যারনের, ব্যারনরা ডিউকের, ডিউক রাজার ভ্যাসাল বা একান্ত অনুগত লোক হতেন। শপথ নিয়ে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতে হত। যে ভ্যাসাল বা অনুগত প্রজা হত সে তার প্রভুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসত, হাত দু'খানা সামনে বাড়িয়ে প্রভুর হাতের উপর রাখত। এভাবে বসে তাকে প্রভুর বশ্যতা এবং আনুগত্য স্বীকার করে প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করতে হত। এরপর প্রভু তাকে তার ভ্যাসাল বলে মেনে নিতেন। তিনি তাকে চুম্বন করতেন, তার হাতে এক দলা মাটি তুলে দিতেন। মাটি হল প্রভুর জমিদারীর প্রতীক।

ভ্যাসাল প্রথা ছিল বংশগত। বাড়ির বড় ছেলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত। একজন ভ্যাসাল মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীকে নতুন করে শপথ নিতে হত। নতুন ভ্যাসাল শপথ নিত তার ওপর-ওয়ালার কর্তাব্যক্তির কাছে। তার নীচের ভ্যাসাল নতুন করে শপথ নিত তার কাছে।

অপরাধীর বিচার করার কর্তব্য রাজার। দোষীকে সাজা দেওয়ার দায়িত্ব রাজার। খাজনা আদায়, করধার্য করা সরকারী কাজ। ভূম্যধিকারী সামন্তরা রাজার এইসব কাজ নিজেদের হাতে নিয়েছিল। নিজের জমিদারীতে কর বসান ও আদায় সামন্তরা করত। প্রজাদের বিচার করত, সাজা দিত। তাদের বিচারের বিরুদ্ধে রাজার কাছে নালিশ করার বা আপিল করার কোন অধিকার প্রজার ছিল না। সামন্তদের শাসনের ফলে সমগ্র দেশের জন্য কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

দুর্গ—দুর্গের ভূমিকা—শিভ্যালরি : সামন্ত প্রধানদের ভিতর সৌহার্দ ছিল না, একতা ছিল না। তারা একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। সুযোগ পেলে একজন আর একজনকে আক্রমণ করত, ঘর বাড়ি লুঠ করত, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করত। শত্রুর আক্রমণের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সামন্তরা দুর্গের মত দুর্ভেদ্য প্রাসাদে বাস করত। এ রকম প্রাসাদের নাম ক্যাসেল। এর জন্য জায়গা লাগত অনেক, মাঝখানে বানাত প্রাসাদ। বাড়িটি হত খুব উঁচু আর শক্ত পাথরের গাঁথুনিতে। এর চারধারে থাকত গভীর জলপূর্ণ পরিখা।



ক্যাসেল বা দুর্গ

পরিখা পার হয়ে ভেতরে ঢোকা সম্ভব ছিল না। বাইরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হত একমাত্র ছোট সেতু দিয়ে। সেতুটিকে আবার দরকার মত তুলে রাখা চলত। ফলে প্রাসাদ দুর্গ বাইরের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। এ রকম সেতু আমাদের দেশের রাজপুতানা, আগ্রা ও দিল্লীর প্রাচীন দুর্গেও ছিল। পাহাড় অঞ্চলের সামন্তরা তাদের দুর্গ বানাত উঁচু টিলা, পাহাড়ের মাথায়। সেখানে শত্রুর আক্রমণ সম্ভব হত না। উঁচু থেকে চারদিকে নজরও ভাল রাখা যেত।

ক্যাসেল বা দুর্গগুলি হত স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাষবাস দোকানপাটের ব্যবস্থাও এর ভেতর থাকত। এতে অসংখ্য ঘর থাকত। তবে ঘরে আলোবাতাস প্রবেশের পথ বড় একটা থাকত না। খুব ছোট জানালা বসান হত। যত বড়ই হোক কোন বাড়িতেই স্নানের ঘর থাকত না। ইউরোপের মানুষ তখন স্নান করত না। ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ নাকি জীবনে দু'দিন মাত্র স্নান করেছিলেন।

যুদ্ধের সময় চাষীদের অসমর্থ বৃদ্ধ শিশু নারীরা দুর্গে আশ্রয় পেত। যুদ্ধে আহতদের জন্য হাসপাতাল থাকত। প্রাসাদের ভেতর আমোদ প্রমোদেরও নানা বন্দোবস্ত করা হত। প্রাসাদের মালিক প্রায়ই বড়

বড় ভোজের আয়োজন করতেন। অনেক মানুষ তাতে যোগ দিত। লম্বা কাঠের টেবিলের দু'ধারে সবাই বসত দুর্গাধিপতি বসতেন টেবিলের মাথায়। পদমর্যাদানুসারে বাকিরা তার ডাইনে বাঁয়ে বসত। সাধারণ লোক, বাড়ীর কর্মচারীদের স্থান হত টেবিলের নিচের দিকে। খাদ্যসামগ্রী থাকত অঢেল। মাছ, মাংস প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শূয়োর ঝলসিয়ে টেবিলের ওপর রাখা হত। শাক-সব্জী মানুষ তখন বড় একটা খেত না। ইউরোপের মানুষ চিনি বানাতে তখনও শেখেনি। তাই মিষ্টি খাবারও তারা খেত না।

মধ্যযুগের অনিশ্চয়তার দিনে বিত্তবানরা দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ের নাম করে ইউরোপের সভ্যতা বজায় রেখেছিল। সামন্তদের অশ্বারোহী সেনা লুঠেরাদের আক্রমণের হাত হতে মানুষের ধনপ্রাণ রক্ষা করেছিল। মধ্যযুগের সামন্ত সভ্যতার এক বিশেষ সৃষ্টি শিভালরী বা নাইট সম্প্রদায়। এরা হল অশ্বারোহী সেনানী। নাইটদের শৌর্যবীর্য, ভদ্রতা, সাহস, মমতার কাহিনী নিয়ে ইউরোপে অসংখ্য গল্প উপকথা প্রচলিত আছে। অনেক ভাল ভাল সাহিত্যও এ নিয়ে রচিত হয়েছে।

সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরাই কেবল নাইট হতে পারত। তখন সামন্তরাই ছিল সম্ভ্রান্ত। সেজন্য তাদের ছেলেরা নাইট হত। কোন সামন্তই নিজের ছেলেকে নিজে নাইট বানাতেন না। ছেলেকে নাইট করার জন্য পাঠাত দূরের অপর কোন সামন্তের দুর্গে।



নাইট

নাইট হবার জন্য চোদ্দ বছর শিক্ষানবিশী থাকতে হত। সাত বছর বয়স হলেই শিক্ষানবিশী হিসাবে তাকে কোন যোদ্ধার বাড়িতে পাঠান হত। তখন হতেই তার শিক্ষা আরম্ভ হত। সে সময় তার উপাধি হত 'পেজ' বা বালক ভৃত্য। তাকে ঘোড়ায় চড়তে, অস্ত্রশস্ত্র নাড়াচাড়া করতে, তদারক করতে শেখান হত। তাকে নম্র হতে, ভদ্র হতে শেখান হত। চোদ্দ বছর বয়স হলে সে হত 'স্কোয়ার'। ঐ সময় সে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে ও ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে শিখত। তাকে তার শিক্ষাগুরু নাইটের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে

যেতে এবং সকল বিষয়ে সাহায্য করতে হত। একুশ বছর পূর্ণ হলে তাকে পুরো নাইট করা হত।

এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নতুন নাইটকে দীক্ষা দেওয়া হত। সে গুরুর কাছে নতজানু হয়ে বসত। গুরু তার কাঁধে তরোয়ালের উল্টো দিক দিয়ে জোরে আঘাত করতেন এবং তাকে নাইটের প্রতিজ্ঞা পাঠ করাতেন। বলতেন, ঈশ্বরের নামে তোমাকে নাইট করলাম। তুমি বীর, সাহসী ও শৌর্যবান হও।

নাইটরা সত্যবাদী, শ্রদ্ধাশীল, দয়াবান, ভদ্র ও বীর যোদ্ধা ছিল। বিপন্নকে রক্ষা করা, নারীর মর্যাদা রক্ষা করা তাদের ধর্ম ছিল। জীবন দিয়েও তারা নারীর মর্যাদা রক্ষা করত। তবে নারী বলতে তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের নারীকেই বুঝত। সাধারণের ঘরের মেয়ে চাষীর ঘরের মেয়ে বৌ তাদের কাছে নারীর মর্যাদা পেত না। তাদের তারা মানুষ বলে মনে করত না।

নাইটরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। নিজেদের ঘোড়া নিজেরা যোগাড় করত। নিজের অস্ত্রশস্ত্র নিজে আনত। লোহার অস্ত্রশস্ত্র তারা ব্যবহার করত। অস্ত্র হত তরবারী, বর্শা। তারা লোহার তৈরি বর্ম পরত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকত। বর্ম পরে নিজেরা ঘোড়ায় উঠতে পারত না। তিন চারজন মিলে তাকে ধরে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিত। তবে সে যুদ্ধে যেত। যুদ্ধের সময় তারা সমষ্টিগতভাবে যুদ্ধ করার চাইতে নিজের ব্যক্তিগত বীরত্ব দেখাতে চেষ্টা করত বেশি। সব সমাজেই নাইটদের খুব খ্যাতি ছিল। সমাজে তারা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করত। তাদের আমলে সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ কিন্তু নিরাপদ ছিল।

ত্রুবেদুর চারণ কবিদল : মধ্যযুগে ইউরোপের শিক্ষিত মানুষের ভাষা ছিল ল্যাটিন। দেশের মানুষের ভাষা যাই হোক না কেন, ল্যাটিন সব দেশেই চলত। লেখাপড়াও হত এই ভাষায়। এই ভাষা বাদে নিজেদের ভাষা কেউ ব্যবহার করত না। তাতে যে কাব্য-সাহিত্য রচনা করা যায় তা কেউ ভাবতে পারত না।

সামন্তদের আমলে পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশে ঐ দেশের ভাষায় কাব্য-গান প্রভৃতি সাহিত্য রচিত হয়। রচনা করেন শিক্ষিত ভদ্র ঘরের সন্তানরা। এদের বলা হয় ত্রুবেদুর বা চারণ কবি। এর আগেও অবশ্য দেশে একশ্রেণীর কবি ছিল। তারা লোক ভাষায় গাথা কাহিনী

মুখে মুখে রচনা করে গান করত। জায়গায় জায়গায় ঘুরে তারা তাদের গান মনুষদের শোনাত। আগে আমাদের দেশেও এই রকম ভাট কবির দল ছিল।

ত্রুবেত্বররা নতুন করে চলিত ভাষায় কাব্যগাথা রচনা করে জনপ্রিয় হন। দেশের জন্য যারা জীবন দিয়েছেন তাদের নিয়ে নতুন করে কাব্য রচনা করতেন। তাছাড়া বীরদের জীবনের কাহিনী, তাদের প্রেম ভালবাসার কথা নিয়েও কাব্য-কবিতা লেখা হত। কবিরা রাজদরবারে এবং বিত্তবানদের বাড়িতে তাদের কাব্য পড়ে শোনাতেন। এই সমস্ত গান, কবিতা সাধারণ মানুষের খুব ভাল লাগত। এখানকার সিনেমার গানের মত তা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। ফলে দেশী ভাষার প্রচলন সহজ হল, ল্যাটিনের একাধিপত্য কমতে লাগল। নিজের দেশের ভাষায় মানুষ লেখাপড়া করতে লাগল। ক্রমে ল্যাটিন ভাষা বিদেশী ভাষা হয়ে গেল। ধর্মের ভাষা, পুজো-প্রার্থনার ভাষাও ক্রমশঃ ল্যাটিনের পরিবর্তে দেশী ভাষায় করা শুরু হল। এই ভাষায় কাব্য, সাহিত্য রচিত হল। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার উন্নতির মূলে ছিলেন নতুন কবি—ত্রুবেত্বররা।

ইংলণ্ডের কবি চসার ছিলেন এই নতুন কবিদলের অগ্রগণ্য। তখনকার দিনের চলতি ইংরেজি ভাষায় তিনি কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যের নাম কেনটারবেরি টেলস। এই বইখানি এখনও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ক্লাসে পড়ান হয়। চসারের কাব্য হতেই ইংরেজি সাহিত্যের সূত্রপাত।

ফ্রান্সের চারণ কবিদের ত্রুবেত্বরই বলা হত। জার্মানির চারণ কবিদের নাম ছিল মিনি সিংগার।

খ. সামন্ততন্ত্রের কথা

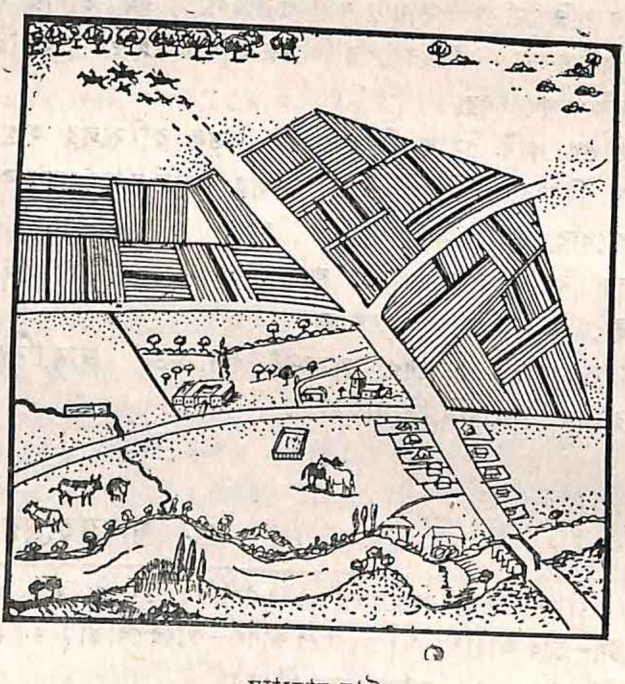
১। ম্যানোর প্রথা—সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উৎস : ২। ম্যানোর হাউস—চাষ-আবাদ : ৩। কৃষকদের জীবন—করের বোঝা : ৪। সমাজের শ্রেণীবিভাগ : ৫। ভূমিদাসদের জীবন :

ম্যানোর প্রথা—সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উৎস : সামন্ত প্রথা গড়ে উঠেছিল জমিকে ভিত্তি করে। এ বিষয়ে আগে কিছু পড়েছ।

দেশের সমস্ত জমি সামন্ত নেতাদের ভিতর বিলি করে দেওয়া হয়। ফলে দেশ জুড়ে গড়ে ওঠে ছোট বড় নানা জমিদারী। সকল জমিদারের জমির পরিমাণ সমান ছিল না। সব জমিদারও তাই সমান ছিল না। সামন্ত নেতাদেব জমিদারীকে বলা হত ম্যানোর। ম্যানোরের অর্থ জমিদারের খাস খামার।

মধ্যযুগের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল জমিদারের খাস খামারগুলি বা ম্যানোর। জমির ওপর তখন সকলকে নির্ভর করতে হত। জমির ফসল ছিল সকলের আয়ের একমাত্র উপায়। টাকা পয়সার তখন তেমন চলন ছিল না। মানুষের হাতে নগদ টাকাও থাকত না। জমির ফসল দিয়েই তাদের সব দেনাপাওনা মেটাতে হত। কাজেই ফসল যাতে ভাল হয়, বেশি হয় তার দিকে তারা বিশেষ নজর রাখত।

ম্যানোর হাউস—চাষ আবাদ : জমিদার সপরিবারে ম্যানোরে বাস করতেন। জমিদার বাড়িকে বলা হত ম্যানোর হাউস। বাড়িটি



ম্যানোর হাউস

হত খুব বড় আর মজবুত। অনেক মানুষ থাকার ব্যবস্থা এতে করা হত। ম্যানোর ভবনের চারধারে থাকত কৃষি জমি। কৃষি জমি ছাড়া রাখা হত গোচরণ ভূমি। জ্বালানীর প্রয়োজন মেটাবার জন্য,

আসবাবপত্র তৈরির জন্য ম্যানোরের ধারে রাখা হত বনভূমি। কৃষি কাজের যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য ছোটোখাটো একটা কারখানাও ম্যানোরে রাখা হত। আর থাকত চাষীরা। ম্যানোরের ধারে চাষীদের জন্য বানান হত কুঁড়ে ঘর। তাদের থাকার জায়গাকে বলা হত গ্রাম। প্রত্যেক ম্যানোরে শস্য রাখার জন্য বড় গোলাবাড়ি থাকত। ধর্ম-কর্ম প্রার্থনা-উপাসনা করার জন্য একটি গীর্জাও প্রতি ম্যানোরে থাকত। ম্যানোরের মালিক জমিদার যে বাড়িতে বাস করত তাকে অনেক সময় ক্যাসেল বা দুর্গও বলা হত। দুর্গের কথা, দুর্গের ভূমিকা সম্বন্ধে আগেই পড়েছ।

সামন্তরা সকলেই নিজের এলাকার মধ্যে স্বাধীন ছিল। তাদের শক্তি ও ক্ষমতা ছিল প্রচুর। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ম্যানোর-গুলি স্থানীয় সরকারের কাজ করত। সামন্তদের নিজস্ব সৈন্য ছিল, বিচারের জন্য আদালত ছিল, দোষী ব্যক্তিকে সাজা দেবার জন্য তাদের জেলখানা পর্যন্ত থাকত। ম্যানোরের মালিক প্রজাদের উপর কর বসাতেন এবং আদায়-উসুল করতেন। বিচারের কাজও নিজেই করতেন। তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে রাজার কাছে কোন আপীল চলত না। ম্যানোরের লোকজন সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করত। রাজা ম্যানোরের মালিককে তাঁর এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলার জন্য দায়ী করতেন।

কৃষকদের জীবন—করের বোঝা : সামন্ততন্ত্রের সব চাইতে নীচের ধাপের মানুষ ছিল কৃষকরা। তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত দুঃখময়। এই সমাজ ব্যবস্থায় তাদের করতে হত সব চাইতে বেশি পরিশ্রম। জন সংখ্যার দিক থেকে তারাই ছিল অধিক। কিন্তু তাদের অবস্থা ছিল সব চাইতে খারাপ। তারা কুঁড়ে ঘরে বাস করত। ঘরগুলি বানান হত কাঠ পাথর দিয়ে। খুপড়ির মত করে। কোন জানালা থাকত না, আলোবাতাস আসত না। তাদের নিজস্ব সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না। দু-একটা রান্না-বান্নার পাত্র, একটা দুটো হাঁড়ি, কয়েকটা ভেড়া আর একটা কুকুর এই নিয়ে হত তাদের সংসার। অতি নিকৃষ্ট খাবার তারা খেত। মোটা মোটা রুটি, কিছু শাকসব্জি আর এক ধরনের টক মদ ছিল তাদের খাবার। মাংস খাবার মত সঙ্গতি তাদের ছিল না। তাদের জামাকাপড় ছিল অতি সাধারণ। শীতের দিনে তাদের কষ্টের সীমা থাকত না। গ্রামের

এখানে সেখানে টুকরো টুকরো ভাবে তাদের জমি দেওয়া হত। জমিরও কোন সীমা চিহ্ন থাকত না। আলাদা চাষ না করে চাষীরা এক সঙ্গে চাষ করত। ফসল ভাগ করে নিত। নিজেদের দরকারী জিনিস তারা নিজেরাই বানিয়ে নিত। বাইরের সঙ্গে তাদের বড় একটা যোগাযোগ ছিল না।

কৃষকদের অবস্থা যত খারাপই হোক তাদের ওপর ছিল করের প্রচণ্ড বোঝা। প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নানা ধরনের কর তাদের দিতে হত। জমিদার যুদ্ধে বন্দী হলে তাকে ছাড়ানোর জন্য কর দিতে হত, একজন জমিদারের মৃত্যুর পর নতুন জমিদার গদীতে বসার খরচের জন্য কৃষকদের কর দিতে হত। জমিদারের ছেলেমেয়ের বিয়ের কর দিতে হত। কর কেবল জমিদারই নিত না। ধর্মের নাম করে চার্চও কর নিত। প্রত্যেকের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ কর চার্চকে দিতে হত। এর নাম ছিল ধর্ম কর। কর ছাড়া প্রত্যেক কৃষককেই জমিদার বাড়িতে বেগার খাটতে হত। নিজের জমির কাজ করার আগে জমিদারের জমিতে চাষ করতে হত।

সমাজের শ্রেণী বিভাগ: সামন্ত সমাজে ছিল তিন শ্রেণীর মানুষ। পাদরী, অভিজাত আর সাধারণ মানুষ। পাদরীরা আর অভিজাতরা সব রকমের সুযোগ সুবিধা ভোগ করত।

অভিজাত আর সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষকদের প্রবল সামাজিক পার্থক্য ছিল। উচ্চ শ্রেণীর মানুষ সাধারণ মানুষ থেকে দূরে থাকত। তাদের ভিতর কোন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম হত না। বিয়ে-সাদি চলত না। মেলামেশাও করত না। উৎসব অনুষ্ঠানেও তারা সাধারণ মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলত। তাদের খাবার জন্য আলাদা জায়গা থাকত। সাধারণ মানুষের সাথে এক সঙ্গে তারা খেত না।

সাধারণ মানুষরা ছিল সংখ্যায় বেশি। কৃষকদের ভিতরও আবার তিন শ্রেণীর চাষী ছিল। প্রথম শ্রেণীর কৃষকদের বলা হত স্বাধীন কৃষক। স্বাধীন কৃষকরা মালিকের কাছ থেকে সরাসরি জমি পেত। যে জমি তারা চাষ আবাদ করত, মালিককে খাজনা দিত। খাজনা দিতে হত নগদে বা শস্য দিয়ে। জমিদার বাড়িতে তাদের কাজ করতে হত না। তারা ইচ্ছা করলে এক জমিদারের এলাকা ছেড়ে অন্য জমিদারীতে যেতে পারত।

দ্বিতীয় দলের কৃষকদের বলা হয় ভিলেন। ভিলেনদের জমির

ফসলের অংশ মালিককে দিতে হত। বছরের কতকগুলি নির্দিষ্ট দিনে এদের জমিদারের ক্ষেতে কাজ করতে হত। কাজের বদলে তারা কোন মজুরী পেত না। বাকী সময় তারা নিজেদের ক্ষেতে কাজ করত। অবশ্য এই জমিও তারা পেত মালিকের কাছ হতে।

ভূমিদাস—ভূমিদাসের জীবনঃ কৃষকদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি ছিল ভূমিহীন কৃষক বা ভূমিদাসরা। এদের বলা হত সারফ। এরা হল তৃতীয় দলের। এদের নিজেদের কোন জমি-জমা ছিল না। এরা মালিকের জমি চাষ করত বিনিময়ে কোন মজুরি পেত না। তবে পেটে খেতে পেত। মালিকের বাড়ি থেকে এরা পেটভাতে কাজ করত তা ছেড়ে তারা অন্য কোথাও যেতে পারত না। জমি বিক্রী হলে সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিক্রী হয়ে যেত। মালিকের অনুমতি ব্যতীত তারা বিয়ে করতে পারত না। সারফদের ছেলে মেয়েকেও সারফ হয়ে থাকতে হত। কোন সারফ পালিয়ে গেলে এবং পরে ধরা পড়লে ভীষণ শাস্তি পেত। কোন সারফ-এর মেয়ে যদি বিয়ে করে অন্যত্র চলে যেত তার জন্য মেয়ের বাবাকে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ত।

দুর্বিসহ জীবন থেকে সারফদের মুক্তির কোন সহজ উপায় ছিল না, তবু তারা মুক্তির জন্য চেষ্টা করত। ধর্ম সঙ্ঘে যোগ দিলে মালিকের কোপ হতে অনেক সময় রেহাই পাওয়া যেত। কেননা ধর্মসম্প্রদায়ের ওপর মালিকদের হাত ছিল না। অনেক সারফ এইভাবে ধর্ম সঙ্ঘে নাম লিখিয়ে জমিদারের হাত থেকে বাঁচত। অনেকে আবার পালিয়ে গিয়ে শহরে আশ্রয় নিত, সেখানে কাজ জুটিয়ে নিত। ব্যবসা-বাণিজ্য বা কারখানার কাজ করত। প্রথম দিকে শহরের উপরও জমিদারদের কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু শহর বড় হতে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। শহর স্বাধীন হয়। স্বাধীন শহরে গিয়ে সারফরা আশ্রয় নিত। অন্য কোন উপায়ে মুক্তির পথ না পেলে নির্যাতিত নিপীড়িত দাস সারফরা অনেক সময় বিদ্রোহী হত। বিদ্রোহ দমন করতে মালিকদের খুব বেগ পেতে হত না। তবে কিছু কিছু সারফ এই ভাবেও জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হত। এই অবস্থা চলেছিল পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

মুক্তির উপায়ঃ প্রকৃত পক্ষে ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হতে সারফরা মুক্তির পথ পায়। এসময় ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যে সারফ ক্রুসেড যুদ্ধে যোগ দেবে সে তার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে। তাই দলে দলে সারফরা ক্রুসেড যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল।

গ্রাম-ভিত্তিক পশ্চিম ইউরোপে ক্রমশঃ শহর গড়ে উঠতে থাকে। শহরে নানা কলকারখানা শিল্প গড়ে ওঠায় সারফরা সামন্তদের কাছ থেকে পালিয়ে ঐ সব কলকারখানায় কাজ করতে থাকে এবং এইভাবে সামন্তদের হাত থেকে রেহাই পায়। আর যারা গেল না, তারা লর্ডদের বিরুদ্ধে আরও তীব্র লড়াই করার জন্য তৈরি হতে থাকে। এমনি এক ভয়ঙ্কর কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৩৫৮ খ্রীঃ ফ্রান্সে।

অনুশীলনী

১। সাধারণ প্রশ্ন :

(ক) মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের মানুষ কিভাবে ধনপ্রান রক্ষা করত ?
(খ) সামন্ততন্ত্র কি করে গড়ে উঠেছিল ?
(গ) মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ।
(ঘ) ম্যানোর প্রথা কাকে বলে। ম্যানোর হাউস সম্বন্ধে যা জান বল ?
(ঙ) মধ্যযুগের কৃষকদের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।
(চ) 'সারফ' কাদের বলা হত ? তাদের অবস্থা কেমন ছিল ?

২। নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) শপথ গ্রহণ প্রথা কি ?
(খ) নাইট কাদের বলা হত ?
(গ) ত্রুবেদুর বা চারণ কবি কারা ?
(ঘ) ক্যাসের বা দুর্গের জীবন কেমন ছিল ?
(ঙ) ভিলেন কাদের বলা হত ? তারা কি করত ?
(চ) নাইটরা কিভাবে যুদ্ধ করত ? তাঁরা কি পরত ?
(ছ) ধর্মকর কি ? কারা এই কর দিত ? আয়ের কত ভাগ কর হিসাবে দিতে হত ?
(জ) ম্যানোর সমাজে কয় শ্রেণীর মানুষ ছিল ? তাদের নাম লিখ।
(ঝ) কৃষকদের ভিতর কাদের স্বাধীন বলা হত ? তাদের অবস্থা কেমন ছিল ?

৩। শূন্যস্থানে কথা বসাও :

(ক) —ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক।
(খ) ক্যাসেল প্রথা ছিল—।
(গ) নাইটরা ছিল—সোনানী।
(ঘ) নাইট হবার জন্য— বছর শিক্ষানবিশী করতে হত
(ঙ) মধ্যযুগের ইউরোপে শিক্ষিত মানুষের ভাষা ছিল—।

১। ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ : ২। সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাব : ৩। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কুটির শিল্পের অগ্রগতি :

ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ : খ্রীশ্চানদের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য মুসলমানদের সাথে খ্রীশ্চানদের দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ চলে দুশ বছরের বেশি। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধ বলা হয়।

যীশুখ্রীষ্ট প্যালসটাইনের জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এইখানেই তিনি ধর্ম প্রচার করেন, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় জেরুজালেমে। তাঁর সমাধিও এইখানে। কাজেই জেরুজালেম হল খ্রীশ্চানদের পবিত্র তীর্থ স্থান। প্রথম চার্চ বা গীর্জাও এই শহরে স্থাপন করা হয়েছিল।

মহম্মদের মৃত্যুর কিছুকালের ভিতর আরবরা জেরুজালেম অধিকার করে খ্রীশ্চান তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে তারা ধর্ম কর নিত। তবে কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করত না। প্রায় সাড়ে চারশ বছর পরে তুর্কীরা জেরুজালেম দখল করে (১০৭৬ খ্রীঃ)। তুর্কীদের দখলে যেতেই খ্রীশ্চান তীর্থযাত্রীদের ওপর নানা অত্যাচার শুরু হয়।

তীর্থযাত্রীদের ওপর দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের কথা পিটার নামে এক খ্রীশ্চান সাধু প্রচার করতে থাকে। চটের পোষাক পরে, খালি পায়ে গাধার পিঠে চড়ে হাতে কাঠের প্রকাণ্ড একখানা ক্রুশ নিয়ে পিটার মুসলমানদের অত্যাচারের কথা প্রচার করে বেড়ায়। মুসলমানদের হাত হতে তীর্থস্থান উদ্ধারের জন্য জনগণকে উত্তেজিত করে তোলে। ধর্মগুরু পোপও জেরুজালেমের মুক্তির জন্য খ্রীশ্চান রাজাদের কাছে আবেদন করেন। ইউরোপের সর্বত্র তীর্থস্থান উদ্ধারের জন্য সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ধর্ম যুদ্ধের সৈন্যদের বলা হয় ক্রুসেডার।

যুদ্ধ শুরু হয় ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমবারের যুদ্ধ দু'ভাগ। প্রথম ভাগে যারা যুদ্ধ করতে যায় তারা হল যুদ্ধ না-জানা গ্রাম শহরের উৎসাহী মানুষ। অনেক পথ পরিক্রমা করে বহু কষ্ট স্বীকার করে তারা জেরুজালেমে এসে পৌঁছায়। অস্ত্রশস্ত্র তাদের বিশেষ কিছু ছিল

না। বড় বড় ক্রুশ কাঁধে নিয়ে খালি পায়ে তারা শহর প্রদক্ষিণ শুরু করে। তারা ভেবেছিল তাদের প্রার্থনার জোরে শহরের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে তাদের পথ করে দেবে। নয় দিন ঘোরার পরও তারা যখন দেখল দেয়াল ধ্বসে পড়ল না, তখন তারা শহর আক্রমণ করল। তুর্কীরা অনায়াসেই তাদের হারিয়ে দিয়ে নির্বিচারে সকলকে বধ করল।

এরপর যারা এল তারা ছিল সাহসী, যুদ্ধে পটু। দলের নেতা ছিল গডফ্রে নামে একজন নরম্যান। তীব্র যুদ্ধের পর অনেক রক্তক্ষয়ের পর গডফ্রে জেরুজালেম অধিকার করেন। খ্রীশ্চানদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে সেও নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করে। জেরুজালেম হাতে রাখার জন্য তিনি জেরুজালেম রাজ্য গঠন করেন। নিজেই হয় তার প্রধান। তাঁর জেরুজালেম জয়ের সতের বছর পর মিশরের সুলতান সালাদিন বিপুল সৈন্য নিয়ে জেরুজালেম আক্রমণ করেন। জেরুজালেম আবার খ্রীশ্চানদের হাত হতে চলে গেল।

ইউরোপে এই সংবাদ পৌঁছাতেই তৃতীয় ক্রুসেডের জন্য তোড়জোড় শুরু হল। এবার ইউরোপের তিনজন বড় বড় রাজা ক্রুসেডে যোগ দেন। এঁরা হলেন জার্মানির সম্রাট ফ্রেডরিক বারবারোসো, ফ্রানসের রাজা ফিলিপ অগাসটাস আর ইংলণ্ডের রাজা রিচারড। রিচারড মস্ত বড় বীর ছিলেন। তাকে বলা হত রিচারড দি লায়ন হার্টেড বা সিংহ হৃদয় রিচারড। দুই দলে ভাগ হয়ে তারা জেরুজালেমের দিকে যাত্রা করেন। জার্মানরা চলে স্থলপথে। অনেক কষ্টে তারা এশিয়া মাইনর পর্যন্ত পৌঁছায়। পথের পরিশ্রমেই অর্ধেক সৈন্য মারা যায়। সম্রাট ফ্রেডরিক নদী পার হতে গিয়ে মারা যান। তার সৈন্যরা যুদ্ধ না করেই ফিরে আসে। ইংলণ্ডের রাজা রিচারড আর ফরাসী রাজ ফিলিপ অগ্রসর হন জলপথে। তারাও জেরুজালেমে পৌঁছান। কিন্তু রিচারডের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিলিপ দেশে ফিরে আসেন। রইলেন কেবল রিচারড একা। দু' বছর যুদ্ধ করেও তিনি সালাদিনের হাত হতে জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারলেন না। রিচারড খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তার আর সালাদিনের যুদ্ধ নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন, কিন্তু একজন আর একজনের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ করতেন না। গল্প আছে একদিন রিচারড অসুস্থ হয়ে পড়লে সালাদিন তাকে ভাল ভাল ফল পাঠান। যুদ্ধে রিচারডের ঘোড়া মারা গেলে সালাদিন তাকে

একটি ভাল আরবী ঘোড়া উপহার দেন। দীর্ঘ দু'বছর যুদ্ধের পর রিচারড সালাদিনের সঙ্গে এক সম্মানজনক চুক্তি করেন। এতে সালাদিন প্রতিশ্রুতি দেন, তীর্থযাত্রীদের ওপর কোন রকম অত্যাচার করা হবে না। এই চুক্তির পর বিচারড ফিরে আসেন।

ধর্মক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারের জন্য ১০৯২ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ক্রুসেডের আয়োজন করা হয়। পোপ তৃতীয় ইনোসেনটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইউরোপের বড় বড় নাইটরা সৈন্য সামান্ত নিয়ে ভেনিস শহরে জড়ো হয়। ভেনিস থেকে জাহাজে করে জেরুজালেম যাবার উদ্দেশ্য। নাইটদের বীরত্ব যতই থাকুক পকেটে কারোই পয়সা ছিল না। ভেনিসের ব্যবসায়ীরা বিনা লাভে কিছু করে না। কম ভাড়ায় তারা জাহাজ দিতে চাইল না। ভেনিসের অন্ধ শাসক ডানাডেলো নাইটদের বলল তারা যদি জারা শহর নষ্ট করতে পারে তবে তাদের জাহাজ দেওয়া হবে। জারা ছিল ভেনিসের ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। খ্রীশ্চান নাইটরা খ্রীশ্চান শহর জারা ধ্বংস করল। জারার মত কনস্তান্তিনোপল শহরও ব্যবসায়ে ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ভেনিসের শাসক চাইলেন নাইটদের দিয়ে কনস্তান্তিনোপল দমন করতে। সেখানে তখন সিংহাসন নিয়েও গোলমাল চলছিল। নাইটরা কনস্তান্তিনোপল অধিকার করল। সেখানে সামন্ততান্ত্রিক শাসন স্থাপন করল। এই সব করে তাদের আর ধর্মক্ষেত্র জেরুজালেম উদ্ধার করার উৎসাহ রইল না। তারা অনেকেই কনস্তান্তিনোপলে রয়ে গেল। কিছু আবার দেশেও ফিরে এল।

চতুর্থ ক্রুসেড্ জেরুজালেম পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গেল। জেরুজালেম খ্রীশ্চানরা উদ্ধার করতে সক্ষম হল না।

সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাব : ইউরোপের সকল সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের উপর ক্রুসেড্ যুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল। গরীব বড়লোক সকলেই এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। নাইটরা বীরত্ব দেখাতে যুদ্ধে যায়। সামন্তরা যুদ্ধের সুযোগে লুঠতরাজ করে আরও বিত্তবান হবার লোভে পড়ে। ব্যবসায়ীরা আসে ব্যবসার নতুন সুযোগ সন্ধান পাবার জন্য। বলা হয়েছিল যুদ্ধে গেলে সারফদের মুক্তি দেওয়া হবে। মুক্তি পাবার জন্য তারা যুদ্ধে যোগ দেয়। মুক্তি পাবার লোভে অপরাধীরা, জেলের কয়েদীরা ধর্মযুদ্ধে যোগ দেয়। এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের মানুষদের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে।

এর আগে তারা নিজেদের দেশের বাইরে যেত না। অন্য মানুষদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল অতি কম। এই যুদ্ধে তারা বিদেশীদের সংস্পর্শে আসে, মুসলমান সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়। মুসলমানদের কাছ থেকে তারা গণিতের সংখ্যা, ঔষধ-পত্র, কাঁচ, কাগজ প্রভৃতি তৈরি করার কৌশল শেখে। ক্রুসেড্ যুদ্ধের ফলে ইউরোপের মানুষ প্রাচ্য দেশের নানা শিল্পের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য—কুটির শিল্পের অগ্রগতি: ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। ইউরোপ আর এশিয়ার ভিতর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার ফলে ইটালীর কতকগুলি শহর বড় হয়। পরে এই শহরগুলি প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি শহর ক্রুসেড্ যুদ্ধের সময় হতেই নামকরা ব্যবসা কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইউরোপের বণিকরা এশিয়া হতে নানা ধরনের বিলাস সমগ্রী, ফুল, ফল, জামাকাপড়, চিনি, মশলা প্রভৃতি আমদানী করত। বেশি দামে ইউরোপের অন্য শহরে বিক্রী করত। তাতে তাদের হাতে প্রচুর অর্থ আসে। ফলে এই সকল দেশের মানুষের জীবন-যাপনের ধারা বদলে যায়।

ধর্মযুদ্ধের সময় ইউরোপের নানাস্থানে কুটির শিল্প স্থাপিত হয়। যুদ্ধে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম এইখানে তৈরি হত। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে ইউরোপের অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসে। সকলকে আর জমির ফসলের উপর নির্ভর করতে হত না। মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পকর্ম করেও জীবন ধারণ করতে শুরু করে।

অনুশীলনী

১। সাধারণ প্রশ্ন:

(ক) ক্রুসেড্ কি? প্রথম ক্রুসেড্ সম্পর্কে যা জান বল।
(খ) তৃতীয় ক্রুসেডের নায়ক কে ছিলেন? তার সম্বন্ধে যা জান বল।
(গ) সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রুসেডের প্রভাব উল্লেখ কর।

২। টীকা লিখ:

(ক) সাধু পিটার (খ) সালাদিন (গ) পোপ তৃতীয় ইনোসেনট।

৩। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) রাজা রিচার্ডের অপর নাম কি ছিল ?

(খ) ফ্রেডরিক কোথাকার সম্রাট ছিলেন ? তিনি কিভাবে মারা যান ?

(গ) ক্রুসেডার কাদের নাম ?

৪। সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :

(ক) ক্রুসেডের প্রথম যুদ্ধ হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে।

(খ) গডফ্রে ছিলেন একজন নরম্যান।

(গ) ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ক্রুসেডের যুদ্ধ শুরু হয়।

(ঘ) ভেনিস ছিল প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র।

(ঙ) সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর ক্রুসেডের কোন প্রভাব পড়েনি।

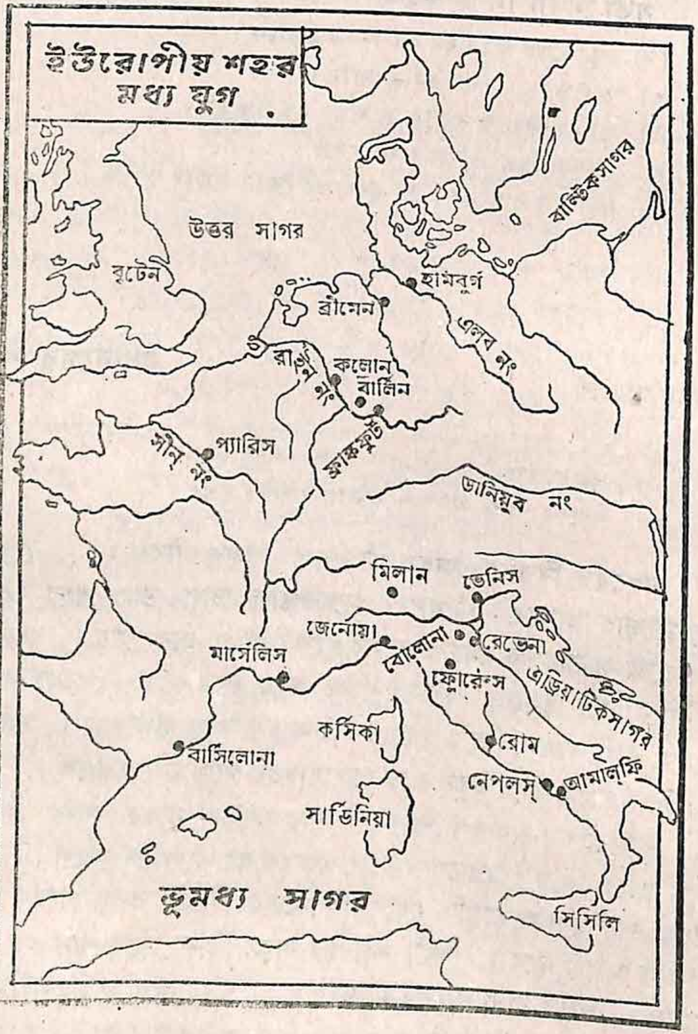
নবম অধ্যায় — মধ্যযুগের শহর

১। শহরের বিস্তৃতি—ব্যবসায়ী মহল—শহর জীবন।
২। শহরের শাসন ব্যবস্থা— বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব।

শহরের বিস্তৃতি—ব্যবসায়ী মহল—শহর জীবন : রোমান সাম্রাজ্যের আমলে ইউরোপে অনেকগুলি ভাল ভাল শহর ছিল। বর্বরদের আক্রমণের সময় প্রায় সব শহরই ধ্বংস হয়ে যায়। বর্বরদের বিশেষ করে হুনদের আনন্দই ছিল শহর ধ্বংস করা। পরবর্তীকালে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার ফলে নতুন করে আবার শহর গড়ে উঠতে থাকে।

ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় ক্রুসেড্ যুদ্ধের আমল হতে। যুদ্ধ করতে গিয়ে ইউরোপের মানুষ অন্য দেশের সংস্পর্শে আসে। নতুন শিল্প, হাতের কাজ প্রভৃতি শেখে। নিজেরা শিল্পের কাজ, হাতের কাজ করতে আরম্ভ করে। শিল্পী কারিগর ব্যবসায়ীদের নিয়ে শহর বড় হতে থাকে। শহরে নানা জাতের মানুষ বাস করত। তবে স্থায়ী বাসিন্দারা ছিল ব্যবসায়ী, শিল্পী কারিগর আর শ্রমিক শ্রেণীর মানুষরা। তখনকার দিনের শহরগুলি মোটেই বড় ছিল না। শহরের ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা এবং একে অন্যকে সাহায্য করবার জন্য একটি করে সমিতি গড়ত। এ রকম সমিতিকে বলা হত ট্রেড-গিলড বা বণিক সমিতি।

পরে শহরের আয়তন ও লোক সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে একটি সমিতির পক্ষে সমস্ত শিল্পী ও শ্রমিকের কাজ পরিচালনা করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তাই প্রত্যেকটি শিল্পের জন্য আলাদা আলাদা সমিতি গঠন করা হয়। এগুলিকে বলা হত ক্র্যাফট-গিলড। ক্র্যাফট-



গিলডগুলি হল এখনকার ট্রেড ইউনিয়নের আদিরূপ। এইভাবে মুচি, তাঁতী ও রুটিওয়ালাদের সমিতি গঠিত হয়। প্রত্যেক সমিতিরই নিজস্ব নিয়মকানুন ছিল, সকলকেই তা মেনে চলতে হ'ত।

শহরের শাসন ব্যবস্থা—বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব : তখনকার দিনের শহরের অবস্থা ভাল ছিল না। রাস্তাগুলো ছিল ধুলো কাদা ভর্তি নোংরা। নর্দমা আর রাস্তায় কোন প্রভেদ ছিল না। শূয়োর কুকুর মনের আনন্দে রাস্তার উপরে ঘুরে বেড়াত। আশপাশের বাড়ি হতে রাস্তার উপরে রাজ্যের জঞ্জাল আর আবর্জনা ছুঁড়ে ফেলা হত। সব শহরেই বাজার থাকত। মেলা বসার জন্য ফাঁকা জায়গা থাকত। রাত্রিবেলা কোন শহরেই রাস্তায় আলো থাকত না।

শহরগুলি যেখানে গড়ে ওঠে সেই জায়গার মালিক ছিল কোন না কোন সামন্তরা। তাই প্রথম প্রথম তারা শহরের উপরও প্রভুত্ব করত। ক্রমশঃ শহরবাসীরা টাকা পয়সা দিয়ে তাদের হাত থেকে মুক্তি ক্রয় করে। শহর চালাবার অধিকার লাভ করে। অনেক শহর আবার সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়, ইটালীতে জার্মানিতে অনেক শহর স্বাধীন ছিল।

শহর পরিচালনা করত শহরবাসীরা। শহরের শাসন কার্যের জন্য তারা নিজেদের ভিতর হতে একজন মেয়র আর কয়েকজন অলডারম্যান নির্বাচন করত। এদের হাতে শহর শাসনের ভার থাকত। শহরের জন্য আইন-কানুন বিধি নিয়ম তৈরি করত।

ব্যবসা-বাণিজ্য করে শহরের এক শ্রেণীর মানুষ বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠল। সামন্ত সমাজে যে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ছিল এরা তাদের কোন দলেই পড়ত না। এরা হল মধ্যবিত্ত। ফরাসী ভাষায় বুর্জোয়া কথার অর্থ হল শহরবাসী মধ্য-শ্রেণীর মানুষ।

অনুশীলনী

১। সাধারণ প্রশ্ন :

(ক) মধ্যযুগের শহর কিভাবে উন্নত হল বল? তখন শহরের অবস্থা কেমন ছিল?

(খ) শহরের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা জান বল।

২। টীকা লিখ :

ট্রেড-গিলড, ক্র্যাফট-গিলড, বুর্জোয়া।

৩। শূন্যস্থানে কথা বসাও :

(ক) —ছিল এখনকার ট্রেড ইউনিয়নের আদিরূপ।

(খ) শহরের শাসনকর্তাকে—বলা হত।

(গ) শহরবাসী মধ্য শ্রেণীর মানুষকে ফরাসী ভাষায় বলা হত—।

(ঘ) শহরের মেয়র ও অল্ডারম্যানরা—হতেন।

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগের চীন এবং জাপান

১. মহা চীনের কথা

(ক) তাঙ যুগের কাহিনী

১। তাঙ যুগ—চীনের সংহতি ও ঐক্য। ২। তাঙ যুগের অবদান—শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প বাণিজ্য। ৩। বৌদ্ধ ধর্ম—চিত্র শিল্প—মুদ্রণ শিল্প : ৪। হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ ও তার ফল।

তাঙ যুগ—চীনের সংহতি ও ঐক্য : প্রাচীন চীনের ইতিহাসের কথা ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমরা পড়েছ। হান বংশের সম্রাটরা ১০০ বছরেরও বেশী সময় রাজত্ব করেন। ২২১ খ্রীঃ হান বংশের পতন হয়। হান বংশের পতনের পর চীন আবার দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশ ভাগ হয়ে যায় অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে। এরা সবাই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকে। এই সময়েও চীনের সম্রাট বলে একজন থাকতেন বটে তবে তাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না। এই অবস্থা চলে প্রায় ৩৫০ বছর। এই সময়ের মধ্যে অনেক রাজবংশ রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁদের দুর্বল শাসনে চীনের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। বাইরের অনেক জাতি চীন আক্রমণ করে। এর মধ্যে প্রধান ছিল মোঙ্গল আর তুর্কীরা। মোঙ্গলরা উত্তর চীন অধিকার করে নেয়। তুর্কীরা পশ্চিম চীনে বারবার আক্রমণ চালায়। এই অক্রমণকারীদের চীনারা বলত তাতার। এই অবস্থা দূর করেন ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে (৫৮৯ খ্রীঃ) সুই বংশের এক রাজা। সুই বংশের আমলে চীনের একতা আবার স্থাপিত হয়। ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য লুপ্ত হয়ে যায় এবং চীনে এক বড় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এই বংশের রাজারা মাত্র ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

তাদের আমলেও তাতার আক্রমণ অপ্রতিহত ছিল। এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুই সম্রাট একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তাঁর নাম ছিল তাই-সু-সুঙ। তাতারদের যুদ্ধে পরাজিত করা অসম্ভব দেখে সেনাপতি তাই-সু-সুঙ তাদের সঙ্গে মিত্রতা করেন এবং তাদের সহায়তায় সুই রাজধানী অধিকার করেন। সুইরাজ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাই-সু-সুঙ সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ তাঙ্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই বংশের রাজারা প্রায় ৩০০ বছর (৬১৮—৯০৭ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন।

তাই-সু-সুঙ নিজে বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেননি। পারিবারিক গোলযোগের জন্য পুত্র তাই-চুঙ-এর হাতে সাম্রাজ্য দিয়ে তিনি বিদায় নেন। সম্রাট হওয়ার আগে তাই-চুঙ-এর নাম ছিল শি-মিন।

তাঙ্ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হলেন তাই-চুঙ। সিংহাসনে বসার পরে তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। উত্তরে মঙ্গোলিয়ার এক অংশ জয় করে তিনি চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিব্বতের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে চীনের সীমানা প্রায় ভারত সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। তাতারদের পরাজিত করে তিনি চীনের অধিকার উরাল হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এর ফলে চীনের প্রাচীন বানিজ্য পথ অর্থাৎ সিল্কওয়ে (রেশম পথ) চীনের অধিকারে আসে এবং এই পথে বিদেশের সহিত চীনের বাণিজ্য পুনরায় স্থাপিত হয়।

চীনের ইতিহাসে তাই-চুঙ কে বলা হয় মহান। তিনি কেবল রাজ্য বিস্তারই করেননি, তাঁর আমলে চীন সর্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করে। তিনি রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। সরকারী কর্মচারী নিয়োগের প্রাচীন নিয়ম বাতিল করে তিনি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের বিধি প্রবর্তন করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজধানী চাঙ-অন-এ পাঠান হত। ফলে চাঙ-অন উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হয়। তাঁর আগে চীনে সম্পত্তির উপর কৃষকদের কোন অধিকার ছিল না। তিনি কৃষকদের জমির মালিক করেন। তিনি ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করেন। রাজধানীর অদূরে সরকারী কর্ম পরিচালনার জন্য তিনি এক নতুন শহর পত্তন করেন। এই শহরটি নির্মাণ কৌশল এবং কারুকার্য ছিল তৎকালীন পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের আদর্শ। টোকিওর

অদূরে জাপানের প্রাচীন রাজধানী এই শহরের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল।

এই বংশের অপর প্রসিদ্ধ রাজার নাম হল সিঙ-হুয়াঙ্। হানলিন স্কুল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। চীনের বহু বিখ্যাত কবি ও শিল্পী তাঁর আমলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাব্য ও শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন।

তাঙ্ যুগের অবদান—শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-বাণিজ্য : তাঙ্ বংশের আমলে চীনের প্রভূত উন্নতি হয়। সেই সময় চীন ছিল খুব সমৃদ্ধ। খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিল না। চীনের মানুষ এই আমলে চা পাতা থেকে সর্বপ্রথম পানীয় ব্যবহার শুরু করে। ক্রমশঃ এই পানীয় সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে রেশম শিল্প, গালার কাজ, চীনা মাটির কাজ প্রভৃতিতে চীনের মানুষ দক্ষতা অর্জন করে। কাগজ এবং বারুদ এই সময় চীনে আবিস্কৃত হয়। এই যুগে চীনের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়। চীনারা সমুদ্র পথে চাল, রেশম, কাগজ, চা, মশলা প্রভৃতি নানা দ্রব্য বিদেশে চালান দিত। এই আমলে ইউরোপের সঙ্গেও চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য চালু হয়। চীনের বিখ্যাত কবি সি-সো এই তাঙ্ যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম—চিত্রশিল্প—মুদ্রণ শিল্প : ধর্ম বিষয়ে তাঙ্ বংশের রাজারা উদার ছিলেন। এ যুগে বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রচার হয়। দ্বিতীয় শতকে তিব্বত থেকে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম চীনে প্রচারিত হয়। তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম ছিল মহাযান পন্থী। সুতরাং চীনেও ধর্ম প্রসার লাভ করে। কালক্রমে ধর্মের নানা গলদ দেখা দেয়। চীনে কনফুসিয়াসের ধর্মমতের ও বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ মিশে সেখানে জৈন বৌদ্ধ বলে এক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। চীনে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কারের জন্য ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্ প্রভৃতি বহু চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত ভারতে আসেন। বহু ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার ও প্রসারের সহায়তা করেন।

বৌদ্ধ ধর্মপদে অন্য ধর্মও এই সময় চীনে প্রবেশ করে। সম্রাট তাই-চুঙ-এর আমলে মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য হজরৎ মহম্মদ চীনে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন এবং মক্কার পর চীনে প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় খ্রীশ্চান ধর্ম এবং পারসিক ধর্ম প্রচারক জরথুস্ট্রের ধর্মমত চীনে প্রচারিত হয়। সকল ধর্মমতই চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ ও তার ফল : চীনের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ্ তাঙ যুগে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ভারতে চৌদ্দ বছর ছিলেন এবং ভারতে সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শন করেন। তিনি তাঁর ভারত পরিভ্রমণ সম্পর্কে একটি পুস্তক লিখে গেছেন। তাঁর



নর্তকীমূর্তি—তাঙ শিল্প

পুস্তক থেকে তখনকার ভারতের অবস্থা জানা যায়। হিউয়েন সাঙ-এর ভারত পরিভ্রমণের কথা অন্য এক অধ্যায়ে দেওয়া আছে। হিউয়েন



বোধিসত্ত্ব—'সহস্র বুদ্ধগুহা'



তাঙ যুগের একটি বৌদ্ধস্তূপ

সাঙ্ বৌদ্ধ ধর্মের অনেক পুঁথিপত্র নিয়ে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে এই সমস্ত পুঁথি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। চীনের মানুষ সরাসরি

বৌদ্ধ ধর্মের মতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং চীনে মহাযানপন্থী মতবাদ প্রবর্তিত হয়।

তাঙ্ যুগের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান মুদ্রনযন্ত্রের আবিষ্কার। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ পণ্ডিতরাই প্রথম বই ছাপা আরম্ভ করেন। তখনকার বই অবশ্য এখনকার মত ছিল না। তখন আলাদা আলাদা অক্ষর ছাপিয়ে বই ছাপান হত না। ছাপা হত বড় কাঠের ব্লকের উপর সম্পূর্ণ এক একটি পৃষ্ঠা খোদাই করে। আলাদা আলাদা অক্ষর সাজিয়ে ছাপার ব্যবস্থা হয় আরও কয়েক শতাব্দী পরে জার্মানির গুটেনবার্গ শহরে। তাঙ যুগে ছাপান অনেক বই স্যার অরেল স্টাইল পশ্চিম চীনের 'সহস্র বুদ্ধগুহা' থেকে উদ্ধার করেছেন। এই বই-এর এক একখানা পাতা ছিল চার ফুট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া। এগুলি সাধারণতঃ গুটিয়ে রাখা হত।

চিত্রশিল্পের জন্যও তাঙ্ যুগ প্রসিদ্ধ। এই যুগের চীনা শিল্পীদের আঁকা বহু চিত্র এই গুহায় পাওয়া গেছে। চিত্রগুলি সাধারণতঃ ধর্মের বিষয় নিয়ে আঁকা।

খ. সুঙ্ যুগ

১। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সরকারী প্রচেষ্টা :
২। কৃষকদের অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা—সরকারী ঋণ প্রকল্প :

ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সরকারী প্রচেষ্টা : তাঙ্ বংশের পতনের পর চীন আবার দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশব্যাপী আবার শুরু হয় যুদ্ধবিগ্রহ। যুদ্ধবাজ সেনাপতিরা আপন আপন এলাকায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে দেশ শাসন করতে থাকে। প্রায় ষাট বছর ধরে চলে এইরূপ নৈরাজ্য অবস্থা। এরপর ক্ষমতায় আসে সুঙ্ বংশ। এই বংশের রাজারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। সুঙ্ বংশের রাজারা প্রায় ৩০০ বছর রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজত্বকালে চীন নানা দিক দিয়ে উন্নতিলাভ করলেও বহিরাক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে না। মোঙ্গলরা বার বার চীন আক্রমণ করে উত্তর চীন অধিকার করে। পশ্চিম চীনেও তাতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

দেশে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষকদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। তারা দারিদ্রের শেষ সীমায় এসে পড়ে। অতি চড়া সুদে মহাজনদের কাছে তাদের ঋণ নিতে হত। সুদের হার পড়ত শতকরা হাজার টাকার উপর। আজীবন ধার শোধ দিয়েও কেউ ঋণমুক্ত হতে পারত না।

কৃষকদের অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা—সরকারী ঋণ প্রকল্প: দেশের দরিদ্র মানুষদের অবস্থার উন্নতির জন্য সুঙ্ রাজাদের ওয়ান-আন-সি নামে এক প্রধানমন্ত্রী একটি পরিকল্পনা করেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের সমস্ত উৎপাদন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে। এর জন্য তিনি কৃষকদের খুব অল্প সুদে সরকার হতে ঋণ মঞ্জুর করেন। চাষীরা ইচ্ছা করলে ফসল দিয়ে বা নগদে সরকারকে ধার শোধ দিতে পারত। এই বাবাদ ব্যয় সামলাবার জন্যে ধনীক শ্রেণীর উপর করভার চাপিয়েছিলেন। সামরিক খাতে যাবতীয় ব্যয়ভার প্রতিটি পরিবারের উপর তিনি ধার্য করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে তাঁর শত্রু ও সমালোচকের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়তে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। সুঙ্ রাজারা তিনশ বছরের বেশি রাজত্ব করেছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণে সুঙ্ বংশের পতন হয় (১২৭৯ খ্রীঃ)। সুঙ্ রাজারা শত্রুর হাত হতে দেশরক্ষা করতে সক্ষম না হলেও তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চীন প্রভূত উন্নতি করে। কাব্য, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন বই লেখা হয়। চিত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে। জাপানে শিল্পীরা চীনের চিত্রশিল্পের অনুকরণ করে তাদের দেশের চিত্রশিল্পের উন্নতি করে। শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের চীন আদর্শ হয়। এই যুগের দু'জন বড় পণ্ডিতের মধ্যে একজনের নাম হল চু-সি-তেং, অপরজন হলেন সু-মান-কুয়াং। সু-মান-কুয়াং ইতিহাস রচনা করে প্রসিদ্ধ হন। চু-সি-তেং কনফুসিয়াসের রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

গ. য়ুআন যুগ

চীনের মোঙ্গল শাসন আমলকে বলা হয় য়ু-আন যুগ। মোঙ্গলরা মাত্র অষ্টআশী বছর চীনে রাজত্ব করে।

তাঙ যুগের পর চীন মোটামুটি তিনটি সাম্রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়। উত্তর চীনে ছিল চীন সাম্রাজ্য, মধ্য চীনে সিয়া এবং দক্ষিণ চীনে সুঙ্ সাম্রাজ্য। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে প্রথম চীনে প্রবেশ করেন।

মোঙ্গলদের আদি নিবাস ছিল মোঙ্গালিয়া দেশের উত্তরে। এরা হল যাযাবর। বাড়ীঘর এদের ছিল না। বাস করত তাঁবুতে। স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এদেশ-সেদেশ করে বেড়াত। এরা কোন সভ্যতার ধার ধারত না। এদের নানা উপজাতি ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চেঙ্গিস খাঁ নামে এক উপজাতি নেতা ঐসব মানুষদের নিজের বশে এনে এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনী নিয়ে চেঙ্গিস খাঁ রাজ্য জয় করতে শুরু করেন। প্রথমেই তিনি আসেন চীনে। চীনের বিখ্যাত মহাপ্রাচীরের ফটকের রক্ষীদের ঘুষ দিয়ে চীনের ভিতর প্রবেশ করেন এবং কিছু অংশ অধিকার করে নেন। এরপর তিনি তুর্কীস্তান, সমরকন্দ প্রভৃতি জয় করে দক্ষিণ রাশিয়ায় যান। দক্ষিণ রাশিয়াও তাঁর দখলে আসে। ভারতেও চেঙ্গিস খাঁ এসেছিলেন। তিনি লাহোর হতেই ফিরে যান। এর পরই তাঁর মৃত্যু হয়। চেঙ্গিসের পর নেতা হন তাঁর পুত্র ওঘোতাই খাঁ। ওঘোতাই খাঁ পোলাণ্ড জয় করে হাঙ্গেরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। ওঘোতাই খাঁর পর সম্রাট হন মঙ্গু খাঁ। ইতিমধ্যে মোঙ্গলরা বাগদাদ, সিরিয়া, তিব্বত ও সমগ্র চীন জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

দক্ষিণ চীনের সুঙ্ রাজাদের সহায়তায় মোঙ্গলরা প্রথমে উত্তর চীনের চীন সাম্রাজ্য অধিকার করে। মধ্য চীন সহজেই তাদের অধিকারে আসে। এরপর মোঙ্গলরা দক্ষিণ চীনের সুঙ্ রাজাদের পরাজিত করে সমগ্র চীনের মালিক হয়।

মঙ্গু খাঁ তার ভাই কুবলাই খাঁকে চীন দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিছুদিন বাদেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং কুবলাই খাঁ সমগ্র মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। মোঙ্গল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কারাকোরাম। পরে কুবলাই খাঁ চীনে পিকিং শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

কুবলাই খাঁ (১২৬৯—৯৫) পিকিং-এ রাজধানী স্থাপন করে চীনেই

থেকে যান। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে বিভিন্ন মোঙ্গল সর্দাররা আধিপত্য করতে থাকে।

কুবলাই খাঁকে চীনের মানুষরা আপন মানুষ বলে মনে করতেন। তিনি পিকিং শহরটি নির্মাণ করেন এবং এর সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য নানা ব্যবস্থা নেন। গুণী-জ্ঞানীদের তিনি ভালবাসতেন। তাঁর রাজসভায় বিভিন্ন দেশের ধর্মযাজক, পণ্ডিত, শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা সমবেত হতেন। কুবলাই খাঁর প্রতাপ ও ঐশ্বর্য ছিল অফুরন্ত। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। চীনের বৌদ্ধরা ছিল তিব্বতে প্রচলিত মহাযানপন্থী বৌদ্ধ।


কুবলাই খাঁ

কুবলাই খাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় তাংমিং রাজবংশ।

কুবলাই খাঁর আমলের কথা জানা যায় মারকো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হতে।

পোলোরা ছিল ইটালীর ভেনিস শহরের ব্যবসায়ী। কুবলাই খাঁর প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্যের কথা শুনে মারকো পোলোর পিতা নিকোলো এবং কাকা মেফিও পোলো ব্যবসার জন্য চীনে যায়। তাদের কাছে খ্রীষ্ট ধর্মের কথা শুনে সম্রাট কুবলাই খাঁ চীন দেশে কয়েকজন খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক আনতে বলেন। পোলোরা দেশে ফিরে আসে। তবে ধর্মপ্রচারক যোগাড় করতে তারা পারে না। তবু তারা আবার চীনে যায়। এবার সতের বছরের মারকোও তাদের সঙ্গী হল। ভেনিস হতে জাহাজে প্রথম তারা আসে সিরিয়া। এরপরে হাঁটাপথে তারা অগ্রসর হয়। পারস্য, আফগানিস্তান হয়ে পামির পর্বতমালা অতিক্রম করে কাসগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান হয়ে তারা এসে পৌঁছায় তিব্বতের উত্তরে গোবি মরুভূমির পারে। পায়ে হেঁটে তারা গোবি পার হয়। এরপর তারা আসে চীনের রাজধানী পিকিং শহরে। পিকিং পৌঁছতে পোলোদের লেগেছিল প্রায় সাড়ে তিন বছর। সম্রাটের দরবারে

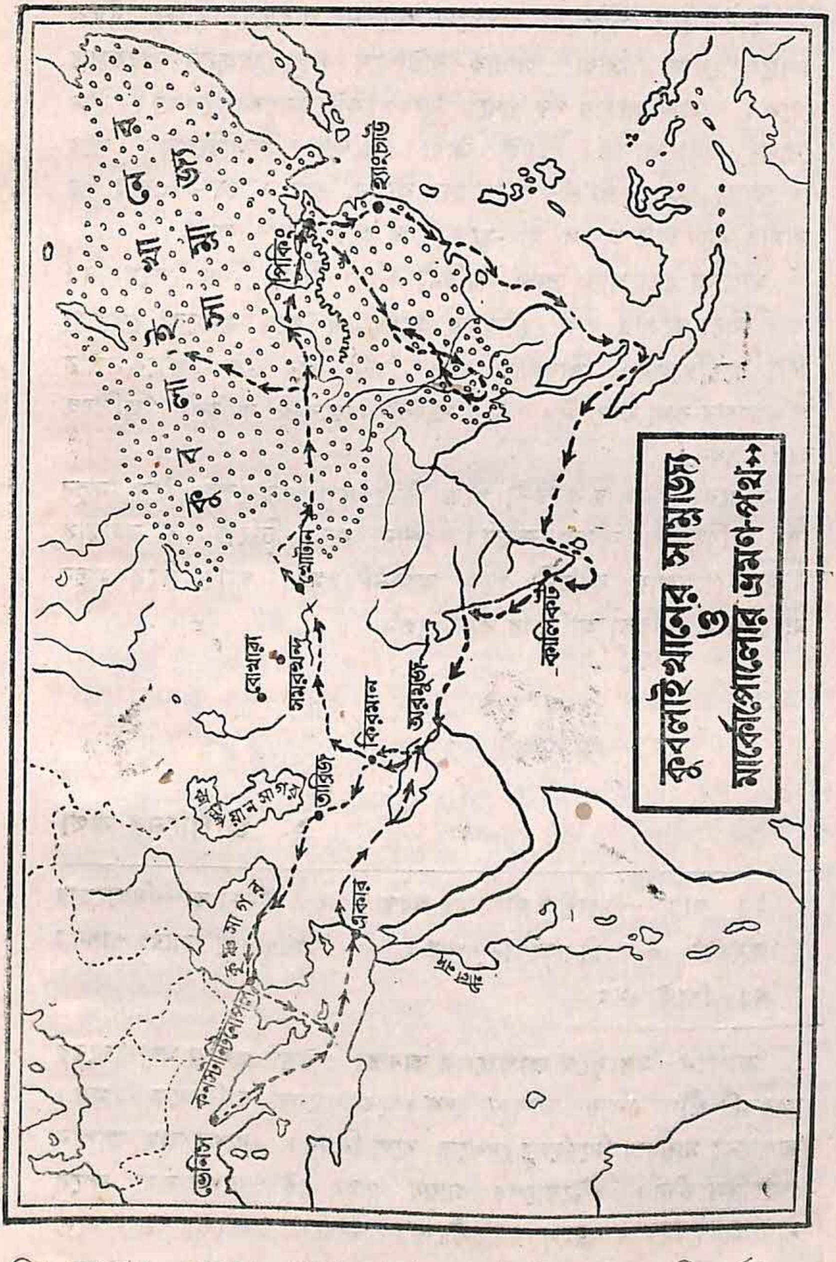
উপস্থিত হলে কুবলাই খাঁ পোলোদের খুব আদর-যত্ন করেন। তরুণ মারকোকে তিনি খুব পছন্দ করেন এবং তার থাকা-খাওয়ার খুব ভাল ব্যবস্থা করে দেন।

মারকোর কাহিনী হতে জানা যায়, চীন সে সময় খুব সমৃদ্ধশালী দেশ ছিল। পিকিং শহরের মত সুন্দর শহর পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। শহরটি ছিল প্রাচীর বেষ্টিত। শহরের মধ্যে আর একটি প্রাচীর ঘেরা শহর ছিল। সম্রাটের প্রাসাদ ছিল এইখানে। প্রাসাদটি ছিল এক বর্গ মাইল। প্রাসাদের দেয়াল, ছাদ সোনায় মোড়া ছিল। মারকো কুবলাই খাঁর বর্ণনাও দিয়েছেন। কুবলাই খাঁ নাকি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। মারকো পোলো চীনের ভাষা শিখেছিলেন। তিনি চীনের সর্বত্র প্রায় পরিভ্রমণ করেন। চীন দেশের মানুষের মত পোষাক মারকো পোলোও পরতেন। কুবলাই খাঁ মারকো পোলোকে হাংচাউ শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছেন, হাংচাউ শহর পিকিং হতেও সুন্দর ছিল। এই শহরে অসংখ্য খাল ছিল। একজনের বাড়ি হতে আরেকজনের বাড়ি যেতে হত খাল পার হয়ে। খালের ওপর বারো হাজার পুল বা সেতু ছিল। পুলগুলো খুব উঁচু ছিল। তার নীচে দিয়ে জাহাজ আসা-যাওয়া করতে পারত। এই শহরে তখন ভারতীয় বণিকরাও ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মালপত্র রাখার জন্য ভারতীয়রা পাথরের গুদাম-ঘর বানাত। শহরে দশটি বড় বড় বাজার ছিল।

মারকো পোলো কুবলাই খাঁর দরবারেরও বর্ণনা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন একটা প্রকাণ্ড সিংহ সম্রাটের সিংহাসনের পাশে চুপ করে বসে থাকত। মারকো চীনে একরকম কালো পাথর দেখেছিলেন যা জ্বালানী কাঠের মত পোড়ান হত। এই পাথর হল কয়লা। চীনেই প্রথম পাথুরে কয়লার ব্যবহার আরম্ভ হয়। চীনে কাগজের টাকার চলন ছিল। মারকোর কাহিনী হতে জানা যায় দুর্ভিক্ষের বছর চীনের প্রজাদের কর দিতে হত না। সরকারী কাজ উপলক্ষে মারকো চীনের বাইরে শ্যাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশও ভ্রমণ করেছিলেন।

প্রায় চব্বিশ বছর পর পোলোরা দেশে ফিরে আসে। সতের খানা চীনা জাহাজে মালপত্র নিয়ে তাঁরা স্বদেশ যাত্রা করে। এক মোঙ্গল রাজকুমারীও তাদের সঙ্গে এসেছিল। পোলোরা তাকে পারস্যে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছিলেন। পোলোদের জাহাজ প্রথমে দক্ষিণ

দিকে চলতে থাকে। পরে পশ্চিম দিকে চলে। এইভাবে চলে তাঁরা এসে পৌঁছান ভারতের মালাবার উপকূলে। পোলোরা ভারতে কিছু-



দিন অবস্থান করেন। তারা মাদ্রাজে সেন্ট টমাসের সমাধি দর্শন

করেন। পোলোর কাহিনীতে ভারতের সাধু-যোগীদের কথা, রাণী রুদ্রম্মার কথাও রয়েছে।

ভারত হতে পোলোরা জলপথে আসেন পারস্য। রাজকুমারীকে এখানে রেখে তাঁরা আবার হাঁটাপথে চলে আসেন নিজেদের দেশে। দেশে আসার পর প্রথমে তাঁদের কেউ চিনতে পারে না। চীন দেশের জামাকাপড় পরেই তাঁরা স্বদেশে এসেছিলেন। পরে পোলোরা এক ভোজসভার আয়োজন করেন এবং খাওয়া-দাওয়ার পর জামার ভাঁজ হতে অংসখ্য মণি-মুক্তো বের করে তাঁদের দেখান।

মারকো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী কিন্তু তিনি নিজে লেখেননি। দেশে ফিরে আসার পর ভেনিসের সঙ্গে এক যুদ্ধে মারকো পোলো বন্দী হয়েছিলেন। কারগারে বসে তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। সেই সহবন্দী মারকোর কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

মারকো পোলোর কাহিনী পড়ে ইউরোপে অনেকের মনে নতুন দেশ আবিষ্কারের বাসনা জাগে। শোনা যায়, ক্রিস্টোফার কলম্বাস মারকো পোলোর কাহিনী পড়ে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে নতুন মহাদেশ আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

২. জাপানের কথা

১। জাপান—মধ্যযুগে জাপানের অবস্থা : ২। মিকাডো—মিকাডোর ক্ষমতা : ৩। চীন-জাপান সম্পর্ক : ৪। বিত্তবান পরিবারের শাসন : ৫। শিন্টো ধর্ম :

জাপান– মধ্যযুগে জাপানের অবস্থা : উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে জাপান দেশ। জাপানের চারিদিকে সমুদ্র। জাপানের মানুষরা নিজেদের দেশকে বলে নিপ্পন। দেশের নাম জাপান রেখেছিল চীন। ইউরোপের মানুষ প্রথম এই দেশের কথা জানে মারকো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীতে। মারকো পোলো জাপানকে বলেছেন জিপাংগু।

জাপানের প্রাচীন যুগের কথা জানা যায় কাহিনী, উপকথা, কিংবদন্তী হতে। কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে, জাপানীরা সূর্যের সন্তান। তাদের সম্রাট দেব বংশের। সূর্যের দু'জন সন্তানের একজন যায় কোরিয়া, অপরজন থাকে জাপানে। কোরিয়ার সাথে জাপানের যে প্রাচীনকাল হতেই সম্পর্ক ছিল এই কাহিনী হতে তা বোঝা যায়।

পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে রিচু নামে এক সম্রাট জাপানের সিংহাসনে বসেন। জাপান তখন এক ঐক্যবদ্ধ দেশ ছিল না। দেশ কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা ছিল। প্রদেশগুলি প্রায় স্বাধীনভাবে চলত।

জাপানের সম্রাটকে বলা হয় মিকাডো। প্রাচীন যুগে সম্রাট দেশ শাসন করলেও পরে দেশ শাসনের ক্ষমতা তাঁর হাতের বাইরে চলে যায়। শাসন ক্ষমতা ছিল দেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি বিত্তবান সম্ভ্রান্ত পরিবারের হাতে। ক্ষমতা লাভের জন্য এই সকল পরিবারের মধ্যে অনবরত সংঘর্ষ চলে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্ষমতা দখলের জন্য এক গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তা চলে দুশ' বছর ধরে। জাপানের ইতিহাসে এই যুদ্ধের নাম চন্দ্রমল্লিকার যুদ্ধ বা ক্রিসেন-থিমামের যুদ্ধ। চন্দ্রমল্লিকা ফুল ছিল সম্রাটের প্রতীক চিহ্ন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁ জাপানে এক অভিযান পাঠান। টাইফুন বা প্রশান্ত মহাসাগরের ঝড়ে পড়ে মোঙ্গল সৈন্যরা মারা যায়। অল্প সংখ্যক যারা বেঁচেছিল জাপানীদের হাতে তারা প্রাণ হারায়। জাপানের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

জাপানের মানুষদের দেশের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। কোন বিদেশী জাপানে প্রবেশ করতে পারত না। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা জাপানে যায়। তারপরে যায় ডাচ বা ওলন্দাজরা। তারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারত না। দু-একটি বন্দরে তারা ব্যাবসা-বাণিজ্য করত। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জাপান বাইরের জগৎ হতে বিছিন্ন ছিল। এই সময় আমেরিকার নৌ সেনাপতি কমোডর পিয়ারি চারখানা জাহাজ নিয়ে জোর করে জাপানে প্রবেশ করে। এরপর ক্রমশঃ জাপান বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়।

মধ্যযুগের গোড়ার দিক হতেই জাপানে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কৃষিপ্রধান দেশের সমস্ত জমির মালিক হয়ে পড়ে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। তারাই দেশ শাসন করত। শাসন

ব্যবস্থার ছিল দুই ভাগ—সামরিক ও বেসামরিক। এক এক পরিবারের হাতে এক এক ভাগ ছিল। জনসাধারণ ছিল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণী তিনটির নামা কুগে বা সম্ভ্রান্ত, বুকে বা সামুরাই, আর হিমিন বা সাধারণ মানুষ। সামুরাইরা ছিল সৈনিক। তারা ছিল প্রকৃত যোদ্ধা। তাদের সাহস ও দেশপ্রেম ছিল অতুলনীয়। মধ্যযুগের ইউরোপের নাইটদের শিভালরির আদর্শের মত জাপানের সামুরাইরা এক উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করে চলত। তাদের আদর্শ বা শিভালরিকে বলা হয় বুশিডো। প্রাচীনকাল থেকে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিল।

জাপানের সমর্থ মানুষমাত্রই সৈনিক হত। শারীরিক অযোগ্যতার জন্য যারা সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করতে পারত না তারা হত কৃষক। যুদ্ধ করা বাদে সৈন্যরা আর কোন কাজ করত না। তাদের ভরণ-পোষণের দায় দায়িত্ব ছিল কৃষকদের ওপর। জমির ফসল দিয়ে কৃষকরা এই দায়িত্ব পালন করত। জাপানের সামন্ততন্ত্রকে বলা হয় সামুরাই প্রথা। সামুরাই প্রথার সর্বোচ্চ উপরে থাকত শোগান। শোগান ছিলেন দেশের সর্বপ্রধান সেনাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী। শোগানের নীচে আর এক শ্রেণীর মানুষ থাকত। তাদের নাম ছিল দাইমিও। দাইমিওদের নীচের সারির মানুষ ছিল সামুরাইরা।

জাপানের সামন্ততন্ত্র চলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত। এই সময় পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে জাপানের মানুষ নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারে। ফলে শোগানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। শোগান পদত্যাগ করেন। দেশের সামন্ত শাসনও লোপ পায়। সম্রাট নিজের ক্ষমতা পুনরাধিকার করে দেশ শাসন করতে থাকেন। জাপানের অগ্রগতি শুরু হয়।

মিকাডো—মিকাডোর ক্ষমতা : নীতিগতভাবে জাপানের সম্রাট মিকাডো ছিলেন দেশের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না। দেশের শাসনভার ছিল কয়েকটি বিত্তবান পরিবারের হাতে। সম্রাট আলাদাভাবে নিজের প্রাসাদে থাকতেন।

সম্রাটের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। দেশে নতুন সংস্কার প্রবর্তন করে সম্রাটের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টাকে বলা হয় টাইকোর

সংস্কার। নতুন কর স্থাপন, স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন, জমি বিলি ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। নতুন সংস্কারে সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং নিজেদের সংখ্যাহানির ভয়ে বিত্তবান পরিবাররা বাধা দিতে থাকে। ফলে সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সংস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন রাজকুমার শোটোকু-তাই-সি।

শোটোকু-তাই-সিকে বলা হয় জাপানী সভ্যতার জনক। জাপানের সভ্যতার উন্নতি হয় বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের পর হতে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোরিয়া হতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম আসে। কোরিয়ার বৌদ্ধ সংঘ জাপানের সম্রাটের নিকট একটি বুদ্ধমূর্তি ও কয়েকখানা ধর্মসূত্র পাঠান এবং বলে দেন, এই ধর্ম হল সভ্য মানুষের ধর্ম। মূর্তি ও ধর্মশাস্ত্র নিয়ে কি করবেন সম্রাট ঠিক করতে পারেন না। এমন সময় রাজকুমার শোটোকু বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই নতুন ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

চীন জাপান সম্পর্ক : মধ্যযুগে চীন ছিল পূর্ব এশিয়ার সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ। চীনের প্রভাব আশেপাশের সকল দেশের ওপর পড়ে। জাপানেও চীনের সভ্যতার প্রভাব পড়ে। জাপানী ছাত্ররা চীনে গিয়ে লেখাপড়া শিখে আসে। জাপানের কাব্য-সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি চীনের অনুকরণে গড়ে ওঠে। রাজধানী নারা শহরটিও চীনের তাঙ্ রাজাদের রাজধানীর অনুকরণে তৈরি করা হয়। এই সমস্ত নানা কারণে চীনের সাথে জাপানের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। চীনে প্রথম চা পানীয়রূপে ব্যবহার করা হয়। জাপানীরাও চীন থেকে চা পানের রীতি অনুকরণ করে। তবে জাপানীরা চা খেত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। জাপানী চায়ের অনুষ্ঠানের নাম চা-নোউ। চা পানের জাপানী-রীতি এখনও প্রচলিত আছে। জাপানীরা সৌন্দর্যপ্রিয় জাতি। তারা যা কিছু করে সুন্দর কোরে করে। অন্যের অনুকরণ করলেও তাতে নিজস্ব বৈশিষ্ট থাকে। তারা ফুল ভালবাসে। অপরূপ কৌশলে তারা ফুল সাজায়। জাপানের ফুল সাজাবার কৌশল জগৎবিখ্যাত। একে বলা হয় ইকাবেনা।

বিত্তবান পরিবারের শাসন : জাপানের শাসনব্যবস্থা ছিল কয়েকটি বৃহৎ পরিবারের হাতে। এই সকল পরিবারের মধ্যে বিশিষ্ট হল ফুজিয়ারা, আসিকাগা, হোজো, মিনামোটো, হোসোকওয়া, টোকুগাওয়া প্রভৃতি।

অষ্টম শতাব্দীতে ফুজিয়ারা পরিবার শাসন ক্ষমতায় আসে। তখন জাপানের রাজধানী ছিল নারা। ফুজিয়ারা দীর্ঘদিন জাপানের ক্ষমতায় ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে শাসনভার লাভ করে মিনামোটো পরিবার। এই পরিবারের প্রধান ছিল ওরিমোটো। কামাফুরায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন কোরে ওরিমোটো জাপানে সামরিক একাধিপত্য স্থাপন করে। সম্রাট তাকে শোগান পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করেন। এর আগের শোগানরা নির্দিষ্টকালের জন্য নিযুক্ত হত। ওরিমোটোর মৃত্যুর (১১৯৯খ্রী:) পর ক্ষমতা পায় হোজো পরিবার। হোজো শাসনকালে সম্রাট পদত্যাগ করেন। হোজো যুগের প্রধান ঘটনা চীনের মোঙ্গল কর্তৃক জাপান আক্রমণ। ক্ষমতা লাভের জন্য বেশ কিছুকাল গৃহযুদ্ধ চলে এবং আসিকাগা পরিবার ক্ষমতায় আসে। আসিকাগারা দেড়শ' বছরেরও বেশি সময় জাপান শাসন করে। এই পরিবারের একজন শোগান হয়। তারা নিজেদের ভিতর ঝগড়া-বিবাদ করত। ফলে দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ক্ষমতা লাভের জন্য হোসোকওয়া পরিবারের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষের ফলে দুই পরিবারই ধ্বংস হয়। জাপানের ক্ষমতা লাভ করে নোবুনাগা। নোবুনাগার শাসনকালে পর্তুগীজরা প্রথম জাপানে আসে (১৫৭২ খ্রী:)। কয়েক বছর পর ওলন্দাজ বণিকরাও জাপানে যায় (১৬০০ খ্রী:)। এই সময় জাপানের শাসন ভার ছিল টোকুগাওয়া পরিবারের হাতে। আড়াইশো বছরেরও পরে। আমেরিকা জাপানে প্রবেশ করলে জাপানের শোগান-প্রথা ভেঙে পড়ে। জাপানের শেষ শোগানের নাম ইয়েযোশি। তিনি ছিলেন টোকুগাওয়া পরিবারের লোক।

শিণ্টো ধর্ম: দেশের সম্রাট মিকাডো যেমন ছিলেন দেশের প্রধান, তেমনি তিনি জাপানের প্রাচীন শিণ্টো ধর্মেরও সর্বপ্রধান পুরোহিত ছিলেন। শিণ্টো কথার অর্থ হল দেবতার পথ। শিণ্টো কথা এসেছে চীনা ভাষা থেকে। প্রকৃতপক্ষে জাপানের প্রচলিত ধর্মের কোন নাম ছিল না। পূর্বপুরুষ পূজা এবং তাদের আদর্শ অনুসরণ করা শিণ্টো ধর্মের অঙ্গ। এই ধর্মের প্রথম উদ্দেশ্য হল দেশপ্রেম শিক্ষা। দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণ আহুতি, এই ধর্ম মতে পুণ্য কাজ। শিণ্টো ধর্মে কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ বা গূঢ় আধ্যাত্মিকতার কথা নেই। এই ধর্মে প্রকৃতির শক্তি বিকাশের বিভিন্ন রূপকে দেবতার মর্যাদা দেওয়া

হত। শিন্টো দেবতাদের নাম ছিল কামি। দেশের রাজাও জীবন্ত দেবতারূপে পূজা পেতেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোরিয়া হতে বৌদ্ধ ধর্ম জাপানে আসে। নতুন ধর্ম জাপানের জনগণ সাদরে গ্রহণ করে। প্রথম কিছুদিন শিন্টো ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সংঘর্ষ চলে। বৌদ্ধরা শিন্টো ধর্মের দেবদেবীকে মেনে নিলে বিবাদের অবসান হয়। এরপর বৌদ্ধ ধর্মই জাপানের প্রধান ধর্ম হয়। জাপানের বৌদ্ধ সংঘ এবং ভিক্ষুকদের সংগঠন খুব শক্তিশালী ছিল। তারা দেশের প্রায় সমস্ত জমির মালিক হয়ে পড়ে। বড় বড় পরিবারের সকলেই বৌদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদের এবং বিত্তবান মানুষদের বাধাদানের জন্য মিকাডো নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন না। তাই দেশে কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে ওঠেনি।

অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) চীনের ইতিহাসে সম্রাট তাই-চুঙ্ স্মরণীয় কেন ?

(খ) তাঙ্ বংশের শাসনে চীন দেশের সমৃদ্ধির ইতিহাস বর্ণনা কর।

(গ) ধর্মক্ষেত্রে তাঙ্ সম্রাটগণের অবদান উল্লেখ কর।

(ঘ) চীনে সুঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? দেশের কল্যাণে ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বংশের সম্রাটদের ভূমিকা কি ছিল ?

(ঙ) কোন্ যুগকে য়ু-আন যুগ বলা হয় ? এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

(চ) মধ্যযুগে চীনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

(ছ) মধ্যযুগে জাপানের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।

২। **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) হান্ বংশের পতনের পর চীনের অবস্থা কেমন ছিল ?

(খ) তাই-সি-সুঙ্ কিভাবে সিংহাসন লাভ করেন ?

(গ) তাঙ্ বংশের শাসনকালে কোন চীনা পরিব্রাজক ও পণ্ডিত ভারতে আসেন ও কেন আসেন ?

(ঘ) তাঙ্ যুগের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান কি ?

(ঙ) শিন্টো ধর্ম সম্পর্কে কি জান ?

(চ) মিকাডো ও শোগান বলতে কি বোঝ ?

(ছ) মধ্যযুগে জাপানের জনসাধারণ কয় ভাগে বিভক্ত ছিল ও কি কি ?

৩। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) তাঙ্ বংশের রাজারা প্রায় ৩০০ বছর রাজত্ব করেছিল।

(খ) তাই-চুঙ্ কৃষকদের জমির মালিক করেন।
(গ) তাই-চুঙ্ 'হানলিন' স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।
(ঘ) সুঙ্ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার।
(ঙ) সুঙ্ যুগের সু-মান্ কুয়াং ইতিহাস রচনা করে প্রসিদ্ধ হন।
(চ) নোবুনাগার রাজত্বকালে পর্তুগীজরা জাপানে আসে।
(ছ) আসিকাগারা মাত্র একশো বছর জাপান শাসন করেন।

৪। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**
(ক) তাঙ্ বংশের সম্রাটদের রাজধানী ছিল—।
(খ) ধর্ম বিষয়ে তাঙ্ সম্রাটরা ছিল গে—।
(গ) ওয়ান-আন্-সি ছিলেন সুঙ্ রাজাদের আমলে একজন—।
(ঘ) মোঙ্গল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল—।
(ঙ) কুবলাই খাঁ—শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।
(চ) —বলা হয় জাপানী সভ্যতার জনক।
(ছ) মিকাডো ছিলেন জাপানের—।

একাদশ অধ্যায় | ক. মধ্যযুগের ভারত

১। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরের কথা : ২। সম্রাট হর্ষবর্ধনের আমল : ৩। হিউয়েন-সাঙের ভারত বৃত্তান্ত :

গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনের পরের কথা : এই বই-এর প্রথম অধ্যায়েই তোমরা পড়েছ হুন আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়।

গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে (৪৫৫-৬৭ খ্রীঃ) হুনরা ভারত আক্রমণ করে। মধ্য এশিয়া হতে হুনরা বের হয়ে একদল যায় ইউরোপে, আর একদল আফগানিস্তান হয়ে আসে পারস্য দেশে। পারস্যের হুনরাই ভারত আক্রমণ করে। তারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনেক অংশ দখল করে এবং পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন করে। এই হুনদের নেতা ছিল তোরমান। তোরমানের পুত্র মিহিরগুল মথুরা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মধ্য ভারত অভিযান করলে মালবের রাজা যশোবর্মন মিহিরগুলকে পরাজিত করেন। মিহিরগুল এরপর কাশ্মীর রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

স্কন্দগুপ্তের পর হতেই গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে। পরের

সম্রাটরা কেউ শক্তিশালী ছিলেন না। সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের সামন্ত রাজারা স্বাধীন হতে থাকে। ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের আয়তন কমে আসে এবং শেষে সম্রাট জীবিতগুপ্তের সময় গুপ্ত সাম্রাজ্য লোপ পায়।

হূন রাজা এটিলার মৃত্যুর পর যেমন হূনরা ইউরোপের জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, ভারতের হূনরাও ভারতের উচ্চ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতের ধর্ম, আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে ভারতের জনসমুদ্রে মিশে যায়। এই সংমিশ্রণের ফলে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নানা দিক দিয়ে প্রভাবিত হয়।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের আমল ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর উত্তর ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপিত হয়। গুপ্ত সম্রাটরা যে অখণ্ড ভারত গড়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন তা নষ্ট হয়ে গেল এবং ভারতের ইতিহাস উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

এই সময় উত্তর ভারতে যে সমস্ত রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে খ্যাতনামা ছিল মালব থানেশ্বর, কান্যকুব্জ বা কনৌজ এবং গৌড়। থানেশ্বর ছিল পূর্ব পাঞ্জাবের একটি ছোট রাজ্য। এই রাজ্যের রাজার নাম ছিল প্রভাকরবর্ধন। তাঁর দুই ছেলে, রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন এবং এক কন্যা রাজ্যশ্রী। কনৌজের মৌখরী বংশের রাজা গ্রহবর্মা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। উত্তর ভারতে কনৌজই ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য এবং যিনি কনৌজের রাজা হতেন তিনিই ভারতে প্রভুত্ব করতেন। তাই কনৌজ অধিকারের নিমিত্ত রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হয়। বঙ্গের রাজা শশাঙ্ক ও মালবের রাজা দেবগুপ্ত উভয়ে একত্রে কনৌজের রাজা গ্রহবর্মাকে নিহত করেন ও রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। রাজ্যশ্রীর ভাই রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করলেও পরে শশাঙ্কের হাতে নিহত হন।


হর্ষবর্ধন

গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসন খালি হয়। অপরদিকে

রাজ্যবর্ধন নিহত হলে থানেশ্বরের সিংহাসনও শূন্য হয়। রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বর এবং কনৌজ উভয় রাজ্যের রাজা হন এবং 'শিলাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। রাজা হয়ে হর্ষবর্ধনের কার্য হল শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়া। এজন্য তিনি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং শশাঙ্ককে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকে আক্রমণ করেন। শশাঙ্ক যুদ্ধে পরাজিত হলেও হর্ষবর্ধন গৌড় জয় করতে সক্ষম হলেন না।

অতঃপর নানা দেশ জয় করে হর্ষবর্ধন এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। পূর্ব-পঞ্জাব, কনৌজ, রোহিলখণ্ড, এলাহাবাদ, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্য অভিযানের প্রচেষ্টাও তিনি করেন, কিন্তু নর্মদা নদীর তীরে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। এরপর তিনি আর দাক্ষিণাত্য অভিযানে যাননি।

হর্ষবর্ধনের কথা আমরা জানতে পারি দু'জনের লেখা থেকে। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' নামক একখানি বইয়ে সম্রাট হর্ষবর্ধনের কথা লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় বইখানি লেখেন হিউয়েন-সাঙ্ বা য়ুয়ান-চোআং। হিউয়েন সাঙ্ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীন থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

হর্ষবর্ধন শুধু একজন বীর যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি সুশাসকও ছিলেন। প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা তিনি নিজে শুনতেন। দিনের এক তৃতীয়াংশ সময় তিনি রাজকার্য দেখাশুনা করতেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী, কাব্য ও নাটক রচনায় তাঁর পারদর্শীতা ছিল। তাঁর রচিত তিনখানি সংস্কৃত নাটকের মধ্যে 'রত্নাবলী' বিশেষ বিখ্যাত। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য হর্ষবর্ধন সম্রাট অশোকের মত বহু দাতব্য চিকিৎসালয়, সরাইখানা, জলসত্র প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিনি প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে এই ধর্মমেলার আয়োজন করতেন। এই মেলায় তিনি সকলকে অকাতরে ধন, রত্ন ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী দান করতেন। তাঁর সময় পাটনার নিকট 'নালন্দা' নামে একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য হর্ষবর্ধন প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। ৬৪৭ খ্রীঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়।

হিউয়েন-সাঙের ভারত বৃত্তান্ত : বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য হিউয়েন সাঙ্ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তখনকার দিনে চীন দেশ থেকে ভারতবর্ষে আসা কষ্টসাধ্য ছিল। তাছাড়া চীনের রাজাও চাইতেন না তার দেশের মানুষ বাইরে যায়।

মহান বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষে আসার জন্য হিউয়েন সাঙ্ সকল রকম কষ্ট স্বীকার করেন। তিনি পায়ে হেঁটে গোবি মরুভূমি পার হয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একজন পথ প্রদর্শক পেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও তাঁকে ছেড়ে যায়। একাই তিনি পথ চলেন। মরুভূমিতে একবার পথ হারিয়ে ফেলেন, সঙ্গে জলের পাত্রটিও ভেঙ্গে যায়, ফলে পাঁচ দিন চার রাত তাঁকে অসহ্য তৃষ্ণায় কষ্ট পেতে হয়। তবু তিনি বুদ্ধের নাম স্মরণ করে পথ চলতে থাকেন। এমন সময় কোথা থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে তাঁর শরীর জুড়িয়ে দেয়, তিনি নতুন উদ্যমে পথ চলেন।

তুরফান ও তাতার দেশ হয়ে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে হিউয়েন সাঙ্ অবশেষে ভারতের কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করেন। কাশ্মীরের রাজা তাঁকে সাদরে সম্বর্ধনা জানান। তিনি প্রায় তের বছর ভারতের নানা জায়গায় ভ্রমণ করে আবার হাঁটা পথে দেশে ফিরে যান। তিনি ভারত সম্বন্ধে একখানি বই লেখেন। এই বই থেকে তখনকার দিনের ভারতের অবস্থা জানা যায়।

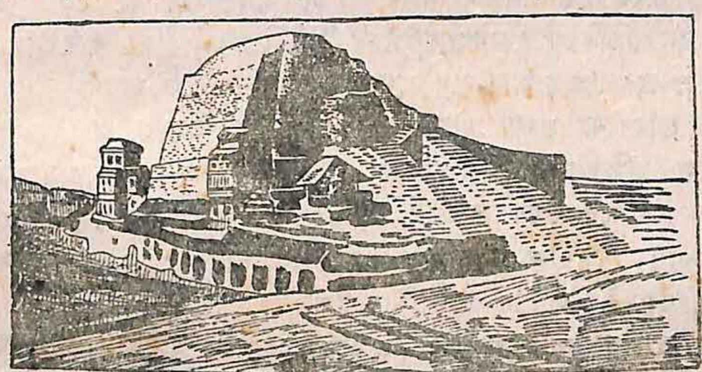


হিউয়েন সাঙ্

হিউয়েন সাঙ্ উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের নানা অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন। তক্ষশিলা, কপিলাবস্তু, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী প্রভৃতি প্রাচীন নগরগুলির তখন ভগ্নদশা। তবে গৌড়, কনৌজ, থানেশ্বর প্রভৃতি শহরগুলি তখন খুব সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। দাক্ষিণাত্যে তিনি অনেক হিন্দু এবং জৈন মন্দির দেখেছিলেন। তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের কথাও তিনি বলেছেন। এটি ছিল একটি বড়

তিনি বলেছেন, রাজ্যের ভিতর ঘুরে ঘুরে হর্ষ শাসন ব্যবস্থা দেখতেন। সম্রাটের একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল। দেশের মানুষকে অল্প রাজস্ব দিতে হত। বিনা পারিশ্রমিকে কোন কাজ করান হত না। সম্রাট ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মানুষ হলেও বৌদ্ধদের শ্রদ্ধা করতেন। দেশে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। ভারতের জনসাধারণের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। শহরে ও গ্রামে মানুষ বাস করত। দেশের মানুষ ছিল খুব ভদ্র আর সৎ। তারা সাধারণভাবে জীবনযাপন করত। দেশে চোর-ডাকাত ছিল। হিউয়েন সাঙ্‌ নিজেই একবার ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তখন অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। দেশে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষকরা ছাত্রদের জন্য খুব পরিশ্রম করতেন।

পাটলিপুত্রের দক্ষিণে নালন্দায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তখনকার ভারতে এটি ছিল শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। হিউয়েন সাঙ্‌ এখানকার অধ্যক্ষ জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্রের কাছে আড়াই বছর পড়াশুনা করেছিলেন। নালন্দায় প্রায় দশ হাজার ছাত্র ও বৌদ্ধ সাধু বাস করত। একশটি বক্তৃতা ঘর ছিল। ছাত্রদের থাকবার জন্য সুন্দর ঘর ছিল। ছাত্রদের বেতন দিতে হত না। দেশের রাজা এবং জনসাধারণের দানে



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চলত। এখানে কঠোর শৃঙ্খলা ছিল। ভোর হতে রাত পর্যন্ত ছাত্রদের পড়াশুনা করতে হত। তারা নিজেদের ভিতর বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করত। পাঠ্য তালিকা দীর্ঘ ছিল। কয়েক বৎসর পড়াশুনা করলে তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারত। এখানে প্রবেশ করা খুব কঠিন ছিল। ভর্তি হবার জন্য পরীক্ষা দিতে হত।

ভারপ্রাপ্ত-পণ্ডিত খুব কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। যারা উত্তীর্ণ হ'ত কেবল তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া হত। বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শন ছাড়া এখানে বেদ, বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, শব্দবিদ্যা প্রভৃতি পড়ান হত।

খ. হর্ষবর্ধনের পরের আমল

১। বিচ্ছিন্ন ভারত—ছোট ছোট রাজ্য : ২। রাজপুত-জাতির কথা : ৩। পাল—প্রতিহার রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতা :

বিচ্ছিন্ন ভারত—ছোট ছোট রাজ্য : সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। বলা চলে তিনিই ছিলেন উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট। হর্ষবর্ধনের পর এবং মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতে আর কোন হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি।

হর্ষের পরে যশোবর্মণ নামে এক রাজা কিছুকাল কনৌজে রাজত্ব করেন। তিনি গৌড়, মগধ, পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন। কাশ্মীরের রাজার আক্রমণে যশোবর্মনের রাজ্য ভেঙ্গে যায়।

হর্ষবর্ধনের সময় গৌড়, কামরূপ, মালব প্রভৃতি রাজ্য স্বাধীন ছিল। দক্ষিণ ভারতের উপরে তাঁর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গিয়ে উত্তর ভারতে গড়ে উঠল কতকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে একতা ছিল না। এই সকল রাজ্যের অধিকাংশই ছিল রাজপুত শাসিত রাজ্য।

রাজপুত-জাতির কথা : ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজপুতরা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের ভিতর মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, রাজপুতরা ভারতের মানুষ। প্রথম হতেই তারা ভারতে বাস করত। বেশির ভাগ পণ্ডিত কিন্তু মনে করেন, রাজপুতরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছিল। রাজপুতদের আদি পুরুষ হ'ল হূন, গুর্জর প্রভৃতি জাতির মানুষ। ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসে এরা ভারতে থেকে যায় এবং ভারতের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি গ্রহণ করে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে যায়। এদের

বংশধররা পরবর্তীকালে রাজপুত জাতি হয়। অবশ্য রাজপুতরা নিজেরা বলে, তারা ভারতের ক্ষত্রিয় জাতি। তাদের কেউ হল সূর্যের সন্তান—সূর্যবংশীয়, কেউ চন্দ্রের—চন্দ্রবংশীয়। রাজপুতদের প্রধান চারটি গোষ্ঠী বলে, তারা চন্দ্র-সূর্য বংশের নয়। তারা হল, অগ্নির সন্তান—অগ্নি কুলাস্তব।

রাজপুতদের ভিতর একতা ছিল না। নানা দলে উপদলে গোষ্ঠীতে তারা বিভক্ত ছিল। নিজেদের ভিতর তারা ঝগড়া মারামারি করত। গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রাধান্য ছিল রাজপুতদের বৈশিষ্ট্য। নিজের গোষ্ঠীর বাইরে তারা বড় একটা যেত না। এদের কয়েকটি প্রধান গোষ্ঠী হল প্রতিহার, চৌহান, সোলাংকি, পরমার প্রভৃতি। সোলাংকি রাজপুতরা চালুক্য নামেও পরিচিত। অন্যান্য রাজপুত গোষ্ঠীর কয়েকটির নাম হল চন্দেলা, হৈহয়, তোমর, গাহড়বাল প্রভৃতি। মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূটরাও রাজপুত ছিল।

রাজপুতরা পশ্চিম ভারতে, মধ্য ভারতে রাজপুতনায় অনেকগুলি রাজ্য স্থাপন করে। প্রতিহাররা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে মধ্য ভারতের কনৌজের পশ্চিমে। তাদের রাজধানী ছিল প্রাচীন অবন্তী শহর। মধ্য রাজস্থানে এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলে চৌহানরা। গুজরাট কাথিওয়াড় অঞ্চল ছিল সোলাংকি রাজাদের দখলে। পরমার রাজপুতদের রাজ্য ছিল মালব। ইন্দোরের কাছে ধার নগরে তাদের রাজধানী ছিল। এছাড়া ছিল বুন্দেলখণ্ডে চন্দেলা রাজপুত গোষ্ঠীর রাজ্য, মেবারে গাহড়বালদের রাজ্য এবং দিল্লী-হরিয়ানা অঞ্চলে তোমর রাজপুত রাজ্য। তোমরা ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী নগরের পত্তন করে। তখন দিল্লীর নাম ছিল দিহিলিকা। দিহিলিকা হতেই দিল্লী নাম হয়। পরবর্তীকালে চৌহানরা তোমর রাজ্য জয় করে নেয়।

পাল—প্রতিহার রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতা : কনৌজ তখনকার দিনে ছিল ভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র। কনৌজ যার অধীনে থাকত তিনিই ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলে স্বীকৃতি পেতেন। তাই কনৌজের অধিকার নিয়ে বঙ্গের পাল রাজা, প্রতিহার রাজা, রাষ্ট্রকূট রাজাদের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এর জন্য বহুদিন ধরে যুদ্ধ বিগ্রহ চলে।

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে কনৌজের রাজা ছিল ইন্দ্রায়ুধ। বঙ্গের রাজা ধর্মপাল তাঁকে পরাজিত করে নিজের মনোনীত চক্রায়ুধকে সিংহাসনে বসান। প্রতিহার রাজ বৎসরাজের এটা পছন্দ হল না।

তিনি ধর্মপালকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন। প্রতিহাররা কনৌজ অধিকার করে। এটা আবার রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব চাইছিলেন না। তিনি কনৌজ অভিযান করে বৎসরাজকে পরাজিত করেন। কিন্তু নিজের দেশের গোলমালের জন্য কনৌজ অধিকার না করেই দেশে ফিরে যান। ফলে চক্রায়ুধই কনৌজের রাজা হয়ে রইলেন। তাঁর প্রভু হলেন বঙ্গের রাজা ধর্মপাল। তবে বেশিদিন এই ব্যবস্থা চলল না। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট মুঙ্গেরের কাছে এক যুদ্ধে ধর্মপালকে পরাজিত করে কনৌজ দখল করেন। এর অল্পদিন পরেই রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ আক্রমণ করে নাগভট্টকে বিতাড়িত করেন। ধর্মপাল আবার তার রাজ্য অধিকার করলেন। প্রতিহাররা কিন্তু ছাড়ল না। দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র ভোজ কনৌজ অধিকার করেন এবং পাঞ্জাব হতে গৌড়ের সীমানা পর্যন্ত এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। গৌড় আক্রমণ করলে তখনকার রাজা দেবপালের কাছে তিনি পরাজিত হন।

দশম শতাব্দীতে ভোজের পর কনৌজের অধিকারী হলেন তার পুত্র মহেন্দ্রপাল। মহেন্দ্রপালের পর রাজা হলেন মহীপাল। মহীপালের রাজত্বের সময় রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় ইন্দ্র কনৌজ অভিযান করে শহরটি ধ্বংস করেন।

গ. বঙ্গদেশের কথা

১। রাজা শশাঙ্ক ও গৌড় রাজ্য ঃ ২। পাল ও সেন রাজাদের কথা ঃ
৩। পাল ও সেন যুগের সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

রাজা শশাঙ্ক ও গৌড় রাজ্য ঃ আগেকার দিনে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিবঙ্গের নাম ছিল গৌড় দেশ। হর্ষবর্ধন রাজা হওয়ার আগেই শশাঙ্ক নামে একজন রাজা এখানে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। প্রথমে শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত সম্রাটদের একজন সামন্ত রাজা। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্বাধীন হন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার জয় করেন। মুরশিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণপুরে তাঁর রাজধানী ছিল। শশাঙ্ক ওড়িশার কিছু অঞ্চলও জয় করে রাজ্য বৃদ্ধি করেছিলেন।

দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলার দাঁতন) থেকে উড়িষ্যার গঞ্জাম পর্যন্ত এবং প্রায় সমগ্র বিহার অঞ্চল শশাঙ্ক নিজ অধিকারভুক্ত করেছিলেন। তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি হয়ে ওঠার ফলে তাঁর প্রতিবেশী কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং কনৌজ থানেশ্বর শক্তি জোটের শরণাপন্ন হলেন। এই শক্তি জোট শশাঙ্করও শক্তি খর্ব করতে সচেষ্ট হল। শশাঙ্কও উত্তর ভারতে নিজের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

শশাঙ্ক কনৌজ জয়ের চেষ্টা করেন। এজন্য হর্ষবর্ধনের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। একটু আগেই সে কাহিনী তোমরা পড়েছ। গৌড় দেশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক মারা যান।

পাল ও সেন রাজাদের কথাঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশ বছর ধরে গৌড় দেশে চরম অরাজকতা চলে এবং বাংলার রাজনৈতিক জীবনে এক দীর্ঘ অস্থিরতার যুগ দেখা দেয়। দেশে কোন প্রবল রাজশক্তি ছিল বলে মনে হয় না। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কনৌজ রাজ যশোবর্মন বাংলা আক্রমণ করে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলা বিধ্বস্ত করেছিলেন। কাশ্মীরের রাজারাও বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। দেশ রক্ষার সক্ষম রাজশক্তির অভাব ও বৈদেশিক শক্তির বার বার আক্রমণে বাংলায় এক প্রচণ্ড অরাজকতা দেখা দেয়। অর্থাৎ বাংলার এই সময়কে বলা হয় মাৎস্যন্যায় অবস্থা। অর্থাৎ পুকুরের বড় মাছ যেমন ছোট মাছ গিলে খায়, গৌড় দেশেও তেমনি বড়রা ছোটদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার মানুষ তখন গোপালদেব নামে একজন জনপ্রিয় সামন্তকে রাজা নির্বাচিত করে। গোপালদেব হলেন প্রথম নির্বাচিত রাজা। তিনি দেশে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন।

গোপালদেব যে রাজবংশ স্থাপন করলেন তার নাম হল পাল বংশ। এই বংশের সকল রাজার নামের শেষে পাল কথাটা ছিল।

গোপালদেবের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র ধর্মপাল (৭৭০ খ্রীঃ)। পাল রাজাদের ভিতর তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সমগ্র বঙ্গদেশ এবং বিহার তিনি নিজের অধিকারে আনেন। ভোজ, মৎস্য-মদ্র-গান্ধার রাজ্যসমূহও তিনি জয় করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন উত্তর ভারতে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করতে। কনৌজের অধিকার নিয়ে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়, সে কাহিনী তোমরা

একটু আগেই পড়েছ। তিনি "উত্তরপথ স্বামী" উপাধি নিয়েছিলেন। ৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ধর্মপালের পর রাজা হলেন দেবপাল। তিনিও রাজ্য বিস্তার করেন। কামরূপের রাজাকে তিনি বশে আনেন, উৎকল রাজাকে পরাজিত করেন। প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের সাথেও তাঁর সংগ্রাম হয়। দেবপালের সময় পাল সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্তার লাভ করে। তাঁর রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত এবং পূর্বে আসাম হতে পশ্চিমে কম্বোজ পর্যন্ত। ভারতের বাইরেও দেবপালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। দেবপালের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। তাতে হাতির সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার।

সুবর্ণ দ্বীপ বা সুমাত্রার বালপুত্রদেব তাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। নালন্দায় বালপুত্রদেব একটি বিহার স্থাপন করেছিলেন, সেই বিহারের খরচের জন্য এই সম্পত্তির প্রয়োজন ছিল। দেবপাল সানন্দে পাঁচটি গ্রাম দান করেন। দেবপাল পাটলিপুত্র অপেক্ষা মুঙ্গেরকেই নিজ রাজধানী হিসাবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের দীর্ঘ উনচল্লিশ বছর পাল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ।

দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল রাজা হন। তারপর রাজা হন নারায়ণ পাল। এঁরা কেউই দেবপালের বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেন নি। পাল সাম্রাজ্য দু'ভাগ হয়ে যায়। আরও পরে প্রথম মহীপাল গৌড় রাজ্য আবার বড় করে তোলেন, কিন্তু তাঁর পরেই গৌড় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন মদনপাল।

দুর্ভাগ্যক্রমে দেবপালের পরবর্তী উত্তরাধীকারীরা কেউই তেমন শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে এই পাল বংশ কয়েকশো বছর বাংলায় রাজত্ব করলেন বটে, কিন্তু দেবপালের পর, পাল সাম্রাজ্যকে আর সাম্রাজ্য বলা যায় না। এটা আঞ্চলিক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

পাল বংশের পতনের পর বাংলায় রাজত্ব করেন সেন বংশের রাজারা। সেন রাজারা বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁরা ছিলেন কর্ণাটকের লোক।

সেন বংশের মাত্র তিনজন রাজা রাজত্ব করেন। এঁরা হলেন বিজয় সেন, বল্লাল সেন এবং লক্ষ্মণ সেন। সেন রাজাদের দুটি রাজধানী ছিল। একটি পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও, অপরটি পশ্চিমবঙ্গের হুগলীর ত্রিবেনীর

কাছে বিজয়পুর। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে বক্তিয়ার খিলজী গৌড়ের রাজধানী অধিকার করে বাংলা দেশে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করে।

পাল ও সেন যুগের সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা ব্যবস্থা : পাল ও সেন রাজারা প্রায় পাঁচ শত বছর বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। পাল ও সেন যুগ বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। এই বাঙ্গালী রাজাদের আমলে, শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি হয়। বর্তমান বাঙ্গালী সমাজের গোড়াপত্তন হল এই সময়ে। বাংলা ভাষা এই আমলে গড়ে ওঠে।

তখনকার দিনেও বাঙ্গালী সমাজে প্রধানতঃ চার শ্রেণীর মানুষ ছিল। সমাজের শীর্ষে ছিলেন ব্রাহ্মণরা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বাদে দেশে অনেক অন্তজ শ্রেণীর মানুষ ছিল। বাংলা দেশে ক্ষত্রিয় কম। বৈশ্য শ্রেণী তাদের জায়গায় আসে। এখনকার মত সেকালে বাঙ্গালীর খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ। পুরুষরা পরত ধুতি, মেয়েরা শাড়ী। ছেলে মেয়ে সকলেই তখন অলঙ্কার পরতে ভালবাসত। উৎসব, আনন্দ হত। নানা দেব-দেবীর পূজা হত। তখনও দুর্গা পূজাই ছিল বৎসরের বড় উৎসব। অন্নপ্রাশন, নামকরণ, উপনয়ন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতেও উৎসব করা হত।

পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁরা অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পাল রাজাদের আমলে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার হয়েছিল। বিক্রমশীলা ও সোমপুরের মহাবিহার পাল রাজাদের তৈরি। বিক্রমশীলা শিক্ষা বিস্তারের জন্য নালন্দার মত খ্যাত ছিল। সোমপুর মহাবিহার বাংলাদেশের রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুরের কাছে। মগধে গঙ্গা নদীর তীরে ছিল বিক্রমশীলা। বড় বড় পণ্ডিতরা এখানে শিক্ষা দিতেন। শত শত ছাত্র এখানে পড়াশুনা করত। বিক্রমশীলা মহবিহারের আচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, তাঁর মত বড় পণ্ডিত তখনকার ভারতে আর ছিল না।

এই যুগে শিক্ষিত মানুষদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। বাঙ্গালী পণ্ডিতরা সংস্কৃত কাব্য লিখেও নাম করেন। সন্ধাকর নন্দী নামে এক কবি রামপালের জীবন নিয়ে 'রামচরিত' কাব্য লেখেন। এর প্রত্যেকটি শ্লোকের দুটি করে অর্থ। এক অর্থে বুঝায় রাজা রামপালকে, দ্বিতীয় অর্থ অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রকে। সেন যুগেও সাহিত্য রচিত হয়,

রাজা বল্লাল সেন নিজেই কবি ছিলেন। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুইখানা কাব্য লিখেছিলেন। গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্যের একখানা শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ। এটিও রচিত হয় সেন রাজাদের আমলে। রচনা করেন কবি জয়দেব। তিনি ছাড়া আর যে সমস্ত কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন হলায়ুধ, ধোয়ী, উমাপতি ধর, শ্রীধর দাস।

সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাদের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম সমাজে প্রাধান্য পায়। রাজাদের সহায়তায় এই সময় বহু ধর্মশাস্ত্র লেখা হয়। রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের ভিতর কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন।

পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা পদ, দোহা, গীত রচনা করে সাধারণ মানুষের ভিতর ধর্ম প্রচার করতেন। এই সমস্ত রচনায় সাধারণ মানুষের ভাষা ব্যবহৃত হত। এইগুলিকে বলা হয় চর্যাগীতি। এই চর্যাগীতি হল বাংলা ভাষার আদি রূপ।

এই যুগে বাংলার শিল্পের চূড়ান্ত উন্নতি ঘটে। প্রাচীন শিল্পের নমুনা দেখা যায় সোমপুর বিহারে। এই সময়কার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন ধীমান, বিতপাল ও শূলপানি।

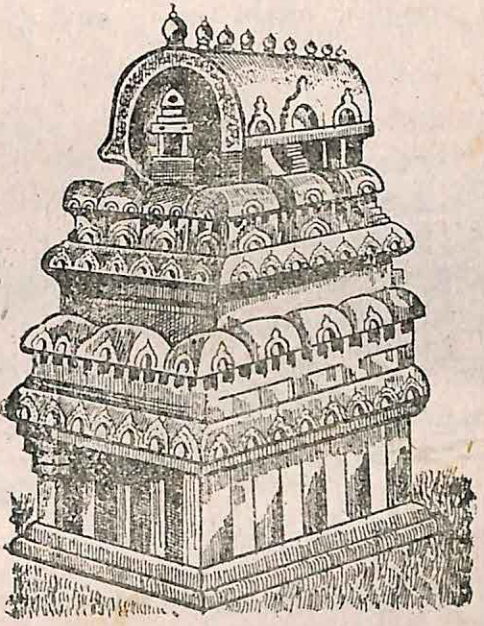
ঘ. দক্ষিণ ভারত

১। চালুক্য রাজ্যের কথা : ২। পল্লব রাজ—পল্লব শিল্প ও সাহিত্য : ৩। চোল রাজাদের কাহিনী :

চালুক্য রাজ্যের কথা : বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ হতে ভারত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত অঞ্চল হল দক্ষিণ ভারত। দক্ষিণ ভারতকে দক্ষিণাপথ অথবা দাক্ষিণাত্যও বলা হয়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় দাক্ষিণাত্যে একটি পরাক্রান্ত রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের নাম চালুক্য। এরা নিজেদের সোলাংকি রাজপুত বলত। এখনকার বিজাপুর জেলায় বাতাপী নগরে চালুক্যদের রাজধানী ছিল। এই জন্য এদের বলা হয় বাতাপী বা বাদামীর চালুক্য বংশ।

এই বংশের প্রথম রাজার নাম জয়সিংহ। তাঁর পৌত্র প্রথম পুলকেশীর সময় হতেই চালুক্যদের উন্নতি আরম্ভ হয়। ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম পুলকেশী রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র কীর্তিবর্ম (৫৬৬—৫৯৭খ্রীঃ) কোঙ্কণ কানাড়া প্রভৃতি জয় করে রাজ্যকে বড় করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০০—৬৪২খ্রীঃ)। তিনি কলিঙ্গ, গুজরাট, মালব প্রভৃতি জয় করেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাথেও তাঁর যুদ্ধ হয়। হর্ষ পরাজিত হন। পল্লব রাজাদের সঙ্গেও



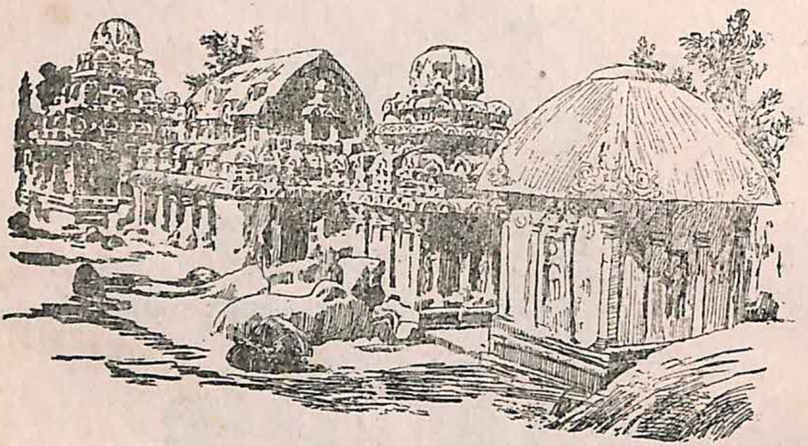
কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির

পুলকেশীর সংগ্রাম হয়। তাঁদের সাথে এক যুদ্ধে তিনি মারা যান। বিজয়ী পল্লবরা বাতাপী নগর ধ্বংস করে ফেলে। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্যের সাথেও পল্লবদের যুদ্ধ হয়। তিনি পল্লবদিগকে পরাজিত করেন। তারপর হতেই চালুক্যশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রকূটরা চালুক্যদের রাজ্য অধিকার করে এক নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

পল্লব রাজ্য—পল্লব শিল্প ও সাহিত্য ঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্য অভিযান করে কাঞ্চীর রাজাকে পরাজিত

করেছিলেন। কাঞ্চীতে তখন পল্লব বংশের রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। দক্ষিণের এই অঞ্চল আগে ছিল সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। সাতবাহনদের পতনের পর পল্লবরা কাঞ্চীতে রাজ্য স্থাপন করে। পল্লবদের আদি ইতিহাস অজ্ঞাত। অনেকে মনে করেন, এরা অন্য দেশ থেকে এসে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে।

শিবস্কন্দ বর্মণ তৃতীয় শতাব্দীতে পল্লব রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে সিংহবিষ্ণু রাজা হয়ে পল্লব রাজ্যের উন্নতি করেন। কাবেরী নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি চোল রাজ্যের এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যের ওপর তাঁর অধিকার



মহাবলীপুরমে রথ মন্দির

প্রতিষ্ঠা করে পল্লব রাজ্যের মর্যাদা বাড়ান। সপ্তম শতাব্দী হতে চালুক্য রাজাদের সাথে পল্লব রাজাদের সংগ্রাম শুরু হয়। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন চালুক্য রাজধানী বাতাপী অধিকার করেন। এই যুদ্ধে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যু হয়। নরসিংহের মৃত্যুর পর হতে পল্লব রাজ্যের অবনতি শুরু হয়। চালুক্যরা কাঞ্চী অধিকার করে। চোল রাজা আদিত্য চোল পল্লব রাজাকে পরাজিত করে ঐ রাজ্যের পতন ঘটায় (৮৯৮খ্রীঃ)।

পল্লব রাজাদের আমলে দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি হয়। কাঞ্চী সংস্কৃত ভাষাসাহিত্য শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভারবী, দণ্ডিণ, জিন্নাগ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার কবি ও দার্শনিকগণ কাঞ্চী নগরীতে বাস করতেন। পল্লব যুগে তামিল ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি

হয়। তামিল গ্রন্থ 'তামিল কুরাল' এই যুগে রচিত হয়েছিল। তামিল ভাষারও এই সময় উন্নতি হয়। স্থাপত্য-শিল্পে পল্লবরা এক নতুন পথ দেখান। পাহাড় কেটে তাঁরা সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এগুলিকে বলা হয় রথ। মাদ্রাজের মহাবলী পুরমে সমুদ্র তীরে এই রথ-মন্দির এখনও আছে। মহাভারতের পাণ্ডবদের নামে রথগুলির নামকরণ করা হয়েছিল। কাঞ্চীর প্রসিদ্ধ কৈলাসনাথ মন্দিরটিও পল্লব আমলে তৈরি হয়।

তাম্র শাসন থেকে বোঝা যায় যে, পল্লবরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য হিন্দু। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন বৈষ্ণব, কেউ কেউ শৈবও ছিলেন। পল্লব রাজদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কবি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। এর ফলে বৈষ্ণব ও শৈব সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। কাঞ্চী হয়ে ওঠে দাক্ষিণাত্যের নালন্দা। কেবল দক্ষিণ ভারতের সভ্যতার প্রসারই নয়, পল্লব নৌশক্তির সাহায্যে সাগর পাড়েও হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে।

চোল রাজাদের কাহিনী : দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, পদুকোট্টাই প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে চোল রাজ্য গঠিত ছিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আগে থেকেই চোলরা ওখানে ছিল। পল্লবদের পরাজিত করে চোলরা একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করে। দশম শতাব্দী হতে চোলদের গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়। রাজরাজ চোল এই রাজ্যকে শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি কেরল ও পাণ্ড্য রাজ্য অধিকার করেন। তাঁর এক বিরাট নৌবহর ছিল। রাজরাজের নৌবহর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিংহলের কিছু অংশ জয় করে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন রাজেন্দ্র চোল। তিনি সমুদ্রপথে সিংহল, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, যবদ্বীপের অংশ বিশেষ জয় করে এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। রাজেন্দ্র চোল কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতে নিজ ক্ষমতা স্থাপন করে ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি উত্তর ভারতে তাঁর বিজয় অভিযান পাঠিয়েছিলেন। বিজয়ী চোল সেনাগণ কলিঙ্গ, উড়িষ্যা জয় করে পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করে পালবংশীয় রাজা মহীপালকে পরাস্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের গঙ্গা নদী পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করে রাজেন্দ্র চোল 'গঙ্গই কোণ্ড' বা গঙ্গা বিজেতা উপাধি গ্রহণ করেন। চীনের সাথে চোল রাজ্যের বাণিজ্য চলত। তাঁর রাজধানী গঙ্গইকোণ্ড-চোলাপুরম, প্রাসাদ উদ্যান ও মন্দির সজ্জিত এক সমৃদ্ধ নগর ছিল।

রাজেন্দ্র চোলের পর রাজাধিরাজ চোল, তারপর দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল রাজত্ব করেন। এই সময় হতে চোল প্রভাব কমতে থাকে। এই বংশের শেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন কুলোতুঙ্গ চোল। তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করেছিলেন। তাঁর পরে চোলরা দুর্বল হয়ে পড়ে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৩১০ খ্রীঃ) সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর চোল রাজ্য অধিকার করে নেয়।

চোল রাজারা এক সুষ্ঠ ও নিপুণ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন পদ্ধতি ছিল চোল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। সমগ্র চোল সাম্রাজ্য কয়েকটি মণ্ডলম-এ ভাগ করা ছিল। কয়েকটি 'নাড়ু' বা জেলা নিয়ে মণ্ডলম গঠিত হত। অর্থনীতির দিক দিয়ে চোল রাজ্য উন্নত ছিল। রোম, সিরিয়া এবং মিশরের সঙ্গে চোল রাজ্যের বাণিজ্য চলত।

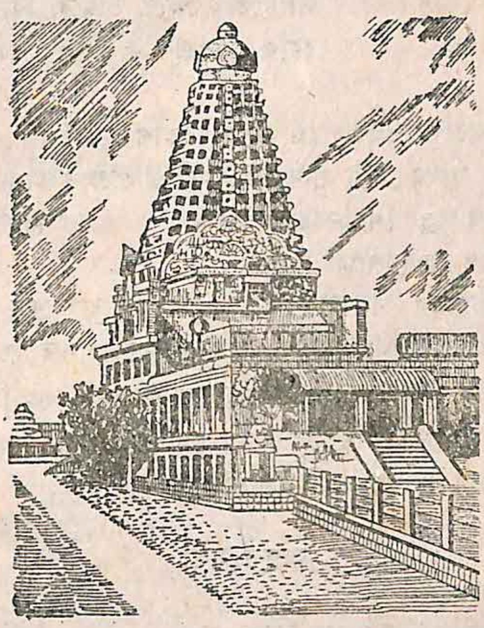
চোল রাজ্য সুশাসিত ছিল। রাজাই ছিলেন শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে। ভূমি রাজস্ব ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান আয়। খাজনার জন্য জমির শ্রেণী বিভাগ করা হত। এছাড়া টোল ও অন্যান্য ধরনের করও ছিল। গ্রামের বিচার গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাহ করত। গ্রামগুলি স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার ভোগ করত। চোল সৈন্যবাহিনী স্থল ও নৌ এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল।

চোল রাজারা ছিলেন হিন্দু। সাম্রাজ্যে বৈষ্ণব মতবাদই প্রবল ছিল। তবে রাজারা ছিলেন শৈব। রাজারা হিন্দু হলেও সহনশীল ছিলেন। অন্য ধর্মের প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা ছিল না।

দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সময় সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের জন্য বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ চলতে থাকে। এরূপ ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে চোল, চের ও পাণ্ড্য তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। চোলমণ্ডলম, পাণ্ড্যমলন ও চের বা কেরল তাদের নিজস্ব সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছিল।

এসময় দাক্ষিণাত্যের সমাজ ব্যবস্থায় 'পঞ্চ মহাসভা'-র প্রাধান্য ছিল। পুরোহিত, জ্যোতিষ, বৈদ্য, রাজপুরুষ এবং সাধারণ প্রজা এই পাঁচটি শ্রেণী নিয়ে পঞ্চ মহাসভা গঠিত ছিল। দাক্ষিণাত্যে দাস প্রথার বড় একটা প্রচলন ছিল না। উত্তর ভারতের মত সামন্ত প্রথা বা জায়গীরদারী প্রথারও চলন ছিল না। দাক্ষিণাত্যের সে সময়

বন্দরগুলি প্রসিদ্ধ ছিল। এই বন্দর হতে পশ্চিম এশিয়া বা দক্ষিণ এশিয়ার সুমাত্রা, জাভা, মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত এবং ঐ সব স্থানে উপনিবেশ গঠন বিস্তারের কাজ চলত। চোল রাজাদের আমলে সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে বৃহত্তর ভারত গড়ে উঠেছিল। ভারতের সংস্কৃতি ঐ সময় ঐসব অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে আজও তার চিহ্ন বর্তমান। চোল



তাঞ্জোরের রাজ রাজেশ্বর মন্দির

রাজাদের নৌবহরের খ্যাতি ছিল। সমগ্র বঙ্গোপসাগর সে সময় চোল হ্রদ নামে পরিচিত হয়েছিল।

ধর্ম আন্দোলনের ফলে দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ধর্ম দাক্ষিণাত্যের স্থায়ী আসন লাভ করলেও পরে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। রাষ্ট্রকূট বংশের অমোঘ বর্ষ ও অন্যান্য ধর্মের কয়েকজন রাজা জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চোল ও পল্লব রাজারা হিন্দু ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। হিন্দু ধর্মের নবজাগরণে দাক্ষিণাত্যের দান অপরিসীম। জগদগুরু, শঙ্করাচার্য, কুমারিলভট্ট, রামানুজ প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকগণ হিন্দু ধর্মের নবজাগরণে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের

প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়েছিল এবং হিন্দুধর্মের নবজাগণ হয়।

এছাড়া দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মেরও প্রভাব দেখা যায়। রামানুজ ছিলেন দাক্ষিণাত্যে ভক্তিমতবাদের প্রবক্তা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের দান কম নয়। দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত চর্চাও হত। সে সময় কাঞ্চী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত চর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারবে, বিহলন, রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ এবং পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে শিল্পকলারও অপূর্ব বিকাশ হয়েছিল। পল্লব রাজগণ সর্বপ্রথম পাথর কেটে মন্দির নির্মানরীতি প্রচলন করেন। মহাবলীপুরমের সপ্তরথ পল্লব শিল্পের চরম নিদর্শন। এছাড়া কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দিরও পল্লব শিল্পের নিদর্শন।

দক্ষিণ ভারতের চোল রাজত্বকালেও শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি হয়। তাঞ্জারের রাজরাজেশ্বর মন্দির, চিদাম্বরমের মন্দির চোল শিল্পের নিদর্শন। বাতাপীর মন্দির এবং অজন্তার কয়েকটি গুহাচিত্র চালুক্য যুগে সৃষ্টি হয়েছিল। রাষ্ট্রকূট আমলে ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির এবং গুহা মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) ভারতে হুন আক্রমণের বিবরণ দাও।

(খ) হর্ষবর্ধন কে ছিলেন ? তাঁর রাজত্বকালের বিবরণ দাও।

(গ) হিউয়েন সাঙ্ কে ? তিনি ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে কি বিবরণ দিয়েছেন ?

(ঘ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(ঙ) পাল ও সেন যুগকে বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ বলা হয় কেন ?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) হর্ষবর্ধনের সভাকবি কে ছিলেন ? তাঁর রচিত একটি গ্রন্থের নাম বল।

(খ) হিউয়েন সাঙ্ কোন্ পথে ভারতে আসেন ? (গ) রাজপুত কারা ? (ঘ) শশাঙ্ক কে ছিলেন ? (ঙ) মাৎসন্যায় কি ? (চ) বিক্রমশীলা কি জন্য বিখ্যাত ? (ছ) পল্লব শিল্প সম্বন্ধে কি জান ?

৩। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) 'রত্নাবলী' নাটকের রচয়িতা ছিলেন—।
(খ) কনৌজ ছিল হর্ষবর্ধনের—।
(গ) হর্ষবর্ধনের সঙ্গে চালুক্যরাজ—যুদ্ধ হয়।
(ঘ) সোলাঙ্কি রাজপুতরা—নামেও পরিচিত।
(ঙ) প্রতিহারদের রাজধানী ছিল—।
(চ) রাষ্ট্রকূট রাজ—বৎসরাজকে পরাস্ত করেন।
(ছ) শশাঙ্কের রাজধানী ছিল—।
(জ) —'উত্তরপথ স্বামী' উপাধি নিয়েছিলেন।
(ঝ) পাল বংশের শেষ রাজা ছিলেন—।

৪। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য হিউয়েন সাঙ্ ভারতে এসেছিলেন। (খ) বল্লাল সেন 'রত্নাবলী' নাটকটি রচনা করেন। (গ) হিউয়েন সাঙ্ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। (ঘ) ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাস্ত করে চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। (ঙ) রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ শহরটি ধ্বংস করেন। (চ) পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন মদন পাল। (ছ) পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। (জ) জয়দেব 'গীত গোবিন্দ' রচনা করেন। (ঝ) কাঞ্চী ছিল পল্লবদের রাজধানী।

৫। **ঠিক কথাটির জায়গায় দাগ দাও :**

(১) থানেশ্বর ছিল প্রভাকরবর্ধন/গ্রহবর্মার রাজধানী।
(২) রাজ্যবর্ধন/হর্ষবর্ধন 'শীলাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন।
(৩) হর্ষবর্ধন/রাজ্যবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ্ ভারতে এসে ছিলেন।
(৪) হর্ষবর্ধন/দেবপাল উত্তর ভারতের শেষ শক্তিশালী হিন্দুসম্রাট।
(৫) কনৌজ/থানেশ্বরের অধিকার নিয়ে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ হয়।

৬। **সময় অনুযায়ী সাজিয়ে দাও :**

যশোবর্মন, গ্রহবর্মা, হর্ষবর্ধন, রাজেন্দ্র চোল, লক্ষণ সেন, ধর্মপাল।

৭। **টীকা লিখ :**

হিউয়েন সাঙ্, নালন্দা, শশাঙ্ক, বিক্রমশীলা, পল্লব শিল্প, চোল শাসন ব্যবস্থা।

৮। **মৌখিক প্রশ্ন :**

(১) রাজ্যশ্রী কে? (২) হর্ষবর্ধন কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন?

(৩) দ্বিতীয় পুলকেশী কোন্ বংশের রাজা? (৪) 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা কে? (৫) নালন্দা কোথায় অবস্থিত ছিল? (৬) 'দিল্লী' নামকরণ কিভাবে হয়। (৭) কত খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক মারা যান। (৮) পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (৯) সেন বংশের কতজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন? (১০) রামচরিত গ্রন্থের রচয়িতা কে? (১১) মহাবলীপুরম্ কিজন্য বিখ্যাত?

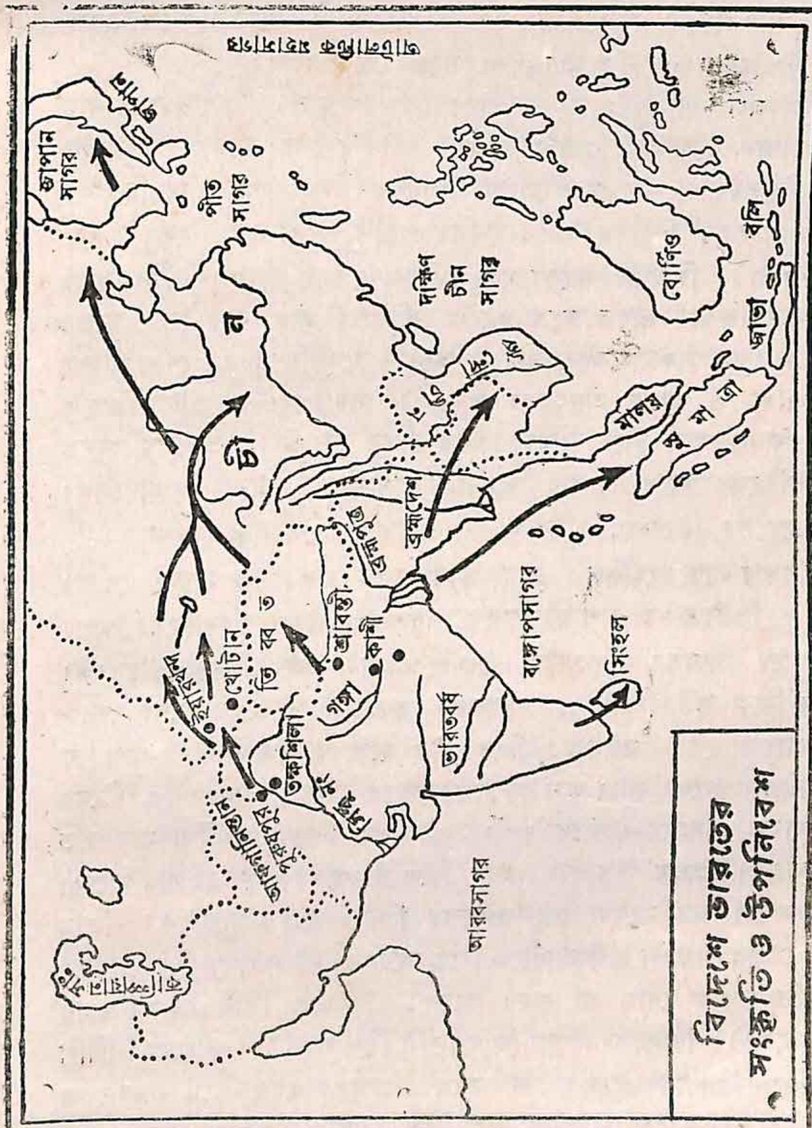
দ্বাদশ অধ্যায় | বিদেশের সাথে ভারতের যোগাযোগ

১। মধ্য এশিয়া—চীন: ২। তিব্বত—অতীশ দীপঙ্কর:
৩। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—সুবর্ণ ভূমি-মালয়-জাভা-সুমাত্রা:

মধ্য এশিয়া—চীন: প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবেশী বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্থলপথে এবং জলপথে উভয় পথেই ভারতের মানুষ দেশের বাইরে যাতায়াত করত। মহেঞ্জো-দরো ও হরপ্পার মানুষ জলপথে মিশর, সুমেরের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। স্থলপথেও তারা আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। সম্রাট অশোকের সময় ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বিদেশের সাথে ভারতের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি সিংহলে নিজের ছেলে মহেন্দ্র আর কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। ভারতের আশে পাশের দেশেও তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। সম্রাট কণিষ্কের সময় মধ্য এশিয়ার কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান দেশ পর্যন্ত ভারতের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। তিনিও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁর চেষ্টায় মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সময় বৌদ্ধদের ভিতর নানা মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদ দূর করার জন্য তিনি এক বৌদ্ধ মহাসম্মেলন করেন। কাশ্মীরে এই অধিবেশন হয়। এর নাম বৌদ্ধ-সঙ্গীতি। এই ধর্ম মহাসভায় আলোচনা হতে বৌদ্ধ ধর্মের দুটি মত—হীনযান ও মহাযান শাখার উৎপত্তি হয়।

ভারতের মানুষ যে মধ্য এশিয়ায় এই সমস্ত অঞ্চলে যাতায়াত করত তার প্রমাণ আছে। এখনকার খোটানের চার পাশে ভারতীয় উপনিবেশ

গড়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ায় গোবি মরুভূমির নীচে ভারতীয় নগর সমূহ চাপা পড়ে আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এখন মাটি খুঁড়ে অনেক নগরের সন্ধান বের করেছেন। স্যার অরেল স্টাইন নামে একজন ইংরেজ



প্রত্নতাত্ত্বিক এই অঞ্চলে খনন কার্য চালিয়ে মাটির তলা হতে বৌদ্ধ-মঠের ভগ্নাবশেষ বুদ্ধ-মূর্তি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ভারতীয় ভাষায় ও

ভারতীয় অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ এই পথ দিয়ে ভারতে এসেছিলেন। আসবার পথে গোবি মরুভূমি পার হবার সময় তিনি এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি এখানে একশ' বৌদ্ধবিহার ও পাঁচ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুক দেখেছিলেন।

মধ্য এশিয়া হতে চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম যায়। সেখান থেকে যায় জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে। চীন দেশের অনেক পরিব্রাজক তীর্থভ্রমণ ও বৌদ্ধ ধর্ম ভালোভাবে জানবার জন্য ভারতে এসেছিলেন। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ই-সিঙ প্রভৃতি তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। হিউয়েন সাঙের কথা তোমরা আগেই পড়েছ। চীন দেশের পরিব্রাজকরা ভারত হতে অনেক পুঁথিপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং সে সব নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে নিতেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের ব্যাখা ও ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের জন্য চীন সম্রাটগণও ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রচারকগণকে চীনে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। ভারতের অনেক পণ্ডিতের সাথে বাংলার জ্ঞানভদ্র যশোগুপ্তও চীনে গিয়েছিলেন। ভারতের চিত্রশিল্প, মূর্তিগঠন ও গুহামন্দির তৈয়ারির কৌশলও চীনে বিস্তার লাভ করেছিল। এখনও চীন দেশের বেশির ভাগ মানুষই বৌদ্ধ।

তিব্বত—অতীশ দীপঙ্কর : ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের অপর পারে তিব্বত। তিব্বতের একদিকে চীন, অপরদিকে ভারতবর্ষ। দু'দিকে দুটি বিরাট দেশ থাকায় তিব্বতকে দু'দেশের সাথেই সম্পর্ক রাখতে হত। তখনকার দিনে চীন হতে ভারতে আসার সোজা পথ ছিল তিব্বতের লাসা হয়ে নেপালের ভিতর দিয়ে। ভারত ও চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য এ পথে হত। এই পথ দিয়েই ধর্মার্থীরা যাতায়াত করত। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে তিব্বতের রাজা স্রং সান গাম্পো নেপাল জয় করেন এবং ভারতের ত্রিহুত পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি একজন নেপালী রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। এই রাজকুমারীর প্রভাবে তিব্বতরাজ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তিব্বতে তিনি এই ধর্ম প্রচার করেন। তিব্বতের নিজস্ব কোন লিপি ছিল না, তিনি ভারতের লিপি দেশে প্রচলন করেন। কালক্রমে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মে নানা রকম দোষ প্রবেশ করে। অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শান্তি রক্ষিত দু'বার তিব্বত যাত্রা করে সেখানকার ধর্মের গলদ দূর করে ধর্ম সংস্কার করেন। পদ্মনাথ নামে আর একজন আচার্যও তিব্বতে

গিয়ে ধর্ম সংস্কার করেন। রাজধানী লাসায় উদন্তপুরের বিহারের অনুরূপ বিহার তৈয়ার হয়। একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর সেখানে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন করে সেখানে মহাযান ধর্মমত প্রচার করেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ঢাকার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। উদন্তপুরের বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য শীল রক্ষিত চন্দ্রগর্ভকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য দীপঙ্কর সুবর্ণ দ্বীপে যান। বারো বছর ঐখানে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সাথে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করেন। শিক্ষান্তে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সিংহলের পথ হয়ে তিনি মগধে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁকে বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হল।

অতীশ দীপঙ্করের সত্তর বৎসর বয়সের সময় তিব্বতরাজ প্রথমবার তাঁকে তিব্বতে যেতে আমন্ত্রণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে অতদূর যেতে তিনি অস্বীকৃত হলেন। এরপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তিব্বত রাজের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একখানা পত্র লিখে দীপঙ্করকে তিব্বত যেতে আবার অনুরোধ করেন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র চিঠিখানি নিয়ে অতীশ দীপঙ্করের সাথে দেখা করেন। এবার আর তিনি না বলতে পারলেন না। তিব্বত যেতে রাজী হলেন।

তিব্বতের দূতগণের সাথে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করলেন। পথে তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। দুবার দস্যুরা তাদের আক্রমণ করেছিল। নেপালের ভেতর দিয়ে চলে শেষ পর্যন্ত তিনি ও দলের লোকেরা তিব্বত গিয়ে পৌঁছালেন।

দীর্ঘ তের বছর তিনি তিব্বতের সর্বত্র ঘুরে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তিরাশী বৎসর বয়সে তিব্বতের রাজধানী লাসার কাছে বিহারে অতীশ দীপঙ্করের মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—সুবর্ণভূমি-মালয়-জাভা-সুমাত্রা : দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রাচীনকালেই ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছিল। চীন এবং তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসার হয়েছিল স্থলপথে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে হয় জলপথে।

অনেক ছোট বড় দেশ ও দ্বীপ এশিয়ায় পূর্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

এর ভিতর প্রধান হল ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড (শ্যাম) ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া (ইন্দোচীন), ইন্দোনেশিয়া। দ্বীপের সংখ্যা ইন্দোনেশিয়ায় অগুন্তি। সুমাত্রা, জাভা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপগুলো ইন্দোনেশিয়ায় অন্তর্গত।

প্রাচীনকালে ভারতের মানুষ এই সমস্ত দেশকে বলত সুবর্ণভূমি। ধন ধান্যে পূর্ণ এই দেশগুলি সত্যই ছিল সোনার মত সমৃদ্ধ। প্রাচীনকাল হতেই ভারতের বণিকরা এই সমস্ত দেশে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। তারা এই অঞ্চলে অনেকগুলি রাজ্য স্থাপন করে। সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, বোর্ণিও, আনাম, কম্বোডিয়া, মালয় প্রভৃতি জায়গায় ভারতীয় নামের অনেক রাজার শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। এখানে যে বৌদ্ধ ও শৈবধর্মের প্রসার হয়েছিল তা এই শিলালিপি হতে জানা যায়। ভারতীয়রা এখানে প্রায় দেড় হাজার বছরের মত রাজত্ব করেন।

ইন্দোচীনে দুটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য ছিল। একটির নাম ছিল চম্পা, অপরটি কম্বোজ। এখন যে দেশকে আনাম বলা হয়, আগের কালের চম্পা রাজ্য ছিল সেখানে। এই দেশে অনেক সমৃদ্ধ নগর ও বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ছিল এখানকার ধর্ম।

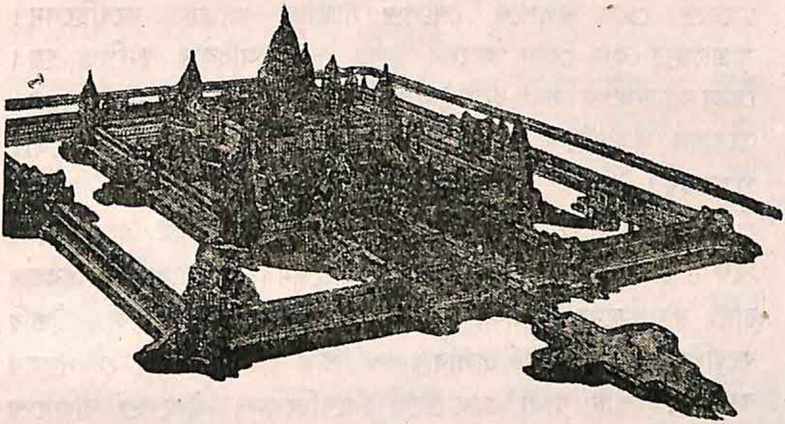
চম্পা রাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তীতে বলা হয় যে (বাংলার বর্তমান বিহারের ভাগলপুরের) চম্পার কয়েকজন ব্যবসায়ী বাণিজ্য করতে সুবর্ণদ্বীপের আনামে আসে। জায়গাটি তাদের খুব পছন্দ হয়। কালক্রমে তারা এখানে একটি ছোট রাজ্য গড়ে তোলে। মাতৃ-ভূমির নাম অনুসারে নতুন রাজ্যের নাম রাখা হয় চম্পা।

চম্পার রাজাদের মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ হলেন হরিবর্মন, ইন্দ্রবর্মন, সিংহবর্মন, রুদ্রবর্মন, জয়সিংহবর্মন। চম্পার রাজারা বীরত্বের সাথে কম্বোজরাজ ও চীন সম্রাট কুবলাই খাঁর আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। প্রায় তেরশ' বৎসর রাজত্বের পর ষোড়শ শতাব্দীতে ক্রমাগত মোঙ্গল আক্রমণে চম্পার পতন ঘটে।

বর্তমান কম্বোডিয়ার আগের দিনের নাম ছিল কম্বোজ। এখানকার হিন্দু রাজারা নশ' বছর আড়ম্বরের সাথে রাজত্ব করেন। কোচিন-চীন, লাওস, শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ এবং মালয় প্রভৃতি অঞ্চলের ওপর কম্বোজের রাজাদের আধিপত্য ছিল। কম্বোজের রাজধানী ছিল যশোধরপুর। এর বর্তমান নাম আঙ্কোরথোম। রাজা জয়বর্ধন রাজধানীটি স্থাপন করেন। এই শহরটি পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং

তার বাইরে ছিল দুশ' হাত চওড়া একটি পরিখা। ছেষট্টি হাত চওড়া পাঁচটি রাস্তা প্রাচীর ঘেরা শহরের কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শহরে অসংখ্য মন্দির ও সরোবর ছিল। শহরের মাঝখানে ছিল বেয়নের বিরাট মন্দিরটি। এটি ছিল শিবমন্দির। পিরামিডের আকারে তিন থাকে মন্দিরটি নির্মিত ছিল। মন্দিরের চারদিকে চল্লিশটি চূড়া ছিল। প্রধান চূড়াটি ছিল দেড়শ' ফুট উঁচু।

আঙ্কোরথোমের এক মাইল দক্ষিণে বিখ্যাত আঙ্কোরভাট মন্দির। এই বিরাট মন্দিরটি নানা স্তরে সাজান ছিল। প্রধান মন্দিরে যেতে হলে অনেক সিঁড়ি, অনেক বারান্দা পার হতে হত। থাকে থাকে সাজান মন্দিরের গায়ে ছিল অপূর্ব কারুকার্য। প্রথমে এখানে শিবের পূজা হত। পরে হতে থাকে বিষ্ণুর পূজা। পৃথিবীর সমস্ত মন্দিরের



আঙ্কোর ভাট

ভিতর এটি সব চাইতে বড়। বিরাট এই মন্দিরটি গভীর বনজঙ্গলের ভিতর ঢাকা পড়েছিল। একজন ফরাসী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এটিকে আবিষ্কার করেন।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য : দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। এটি ছিল প্রকৃত পক্ষে একটি সাম্রাজ্য। আর শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা এখানে শাসন করতেন। তাই একে বলা হত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য। রাজ্যটি স্থাপিত হয় প্রথম শতাব্দীতে। শৈলেন্দ্র রাজারা মহারাজ উপাধি ব্যবহার করতেন। তাঁদের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের তুলনা ছিল না।

আরবের বণিকরা শৈলেন্দ্র সম্রাটদের ঐশ্বর্য ও শক্তির প্রশংসা করেছে। অষ্টম শতাব্দীতে তারা বাণিজ্য করতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এসেছিল। আরব বণিকরা শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যকে পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিশালী ও সম্পদশালী রাজ্য বলে অভিহিত করেছে। সাম্রাজ্যের দৈনিক রাজস্বের পরিমান নাকি ছিল দু-শত মন সোনা। মহারাজা একটি দিঘীতে রোজ একখানা করে সোনার ইট নিক্ষেপ করতেন।

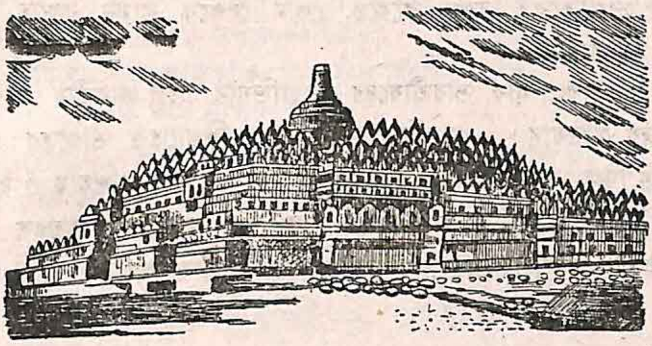
শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের শক্তির উৎস ছিল তাদের বিরাট নৌবহর। এই নৌবহর নিয়ে শৈলেন্দ্র রাজারা নিকটবর্তী চম্পা ও কম্বোজ রাজ্যে হানা দিত। দীর্ঘদিন ধরে চম্পা ও কম্বোজের সাথে শৈলেন্দ্র সম্রাটদের যুদ্ধ চলেছিল। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভরতের চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোল জলপথে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য আমক্রণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশের উপর চোল অধিকার স্থাপিত হয়। চোল আক্রমণের সময় হতে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের শক্তির ক্ষয় শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন হয়।

শৈলেন্দ্র রাজা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ। ভারতবর্ষ এবং চীনের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। এই বংশের একজন রাজা বানপুত্রদেব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সঙ্ঘারাম তৈরি করেছিলেন। এর খরচ চালাবার জন্য তিনি বাংলার রাজা দেবপালের কাছ থেকে পাঁচ খানা গ্রাম চেয়ে নিয়েছিলেন। শৈলেন্দ্র রাজাদের রাজগুরু ছিলেন বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমার ঘোষ।

শৈলেন্দ্র রাজারাও অনেক সুন্দর মন্দির তৈরি করেছিলেন। তাঁদের তৈরি বড়বুদরের মন্দির জগৎ বিখ্যাত। মন্দিরটি ছিল ছোট একটি পাহাড়ের ওপর। মন্দিরটিতে পর পর ষাটটি ধাপ আছে। মন্দিরের শীর্ষে একটি বৌদ্ধ স্তূপ। ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি মন্দিরের চার পাশে খোদিত। মন্দিরের সিঁড়ির ধারে ধারে এবং দেওয়ালের ওপরও অনেক মূর্তি খোদাই করা ছিল।

ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য প্রচার হয় জাভা বা যবদ্বীপে সব চাইতে বেশি। এখনও এই দেশে অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় হাতে লেখা নানা পুঁথিপত্র এখানে আছে। রামায়ণ-মহাভারত এরা নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করেছিল।

রামায়ণ-মহাভারতের গল্প আজও এখানে জনপ্রিয়। এই সমস্ত অঞ্চলে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তৃতি দেখে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর নাম দিয়েছিলেন দ্বীপময় ভারত।



বড়বুদর

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপরাপর দেশ সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মের সাথেও ধর্মের মাধ্যমে ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সম্রাট অশোকের সময় হতে এই সমস্ত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। শ্যাম দেশে মগধ হতে ধর্ম প্রচারক গিয়ে ধর্ম প্রচার করেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশে শ্রীক্ষেত্র নামে একটি ভারতীয় রাজ্য ছিল। ব্রহ্ম নামটিও ভারতীয়। শ্যাম দেশের মানুষের নাম এখনও ভারতীয় নামের অনুরূপ। এখানকার সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতীয় আদর্শে গঠিত।

সিংহল দেশের বর্তমান নাম শ্রীলঙ্কা। লঙ্কা নামটি ভারতে বিশেষ পরিচিত। রামায়ণের অনেক ঘটনা এখানে ঘটে। দেশটিও ভারতে সংলগ্ন। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এখানে সহজেই প্রবেশ করে। এখনও এই দেশের বেশির ভাগ মানুষ বৌদ্ধ। সম্রাট অশোক এখানে ধর্ম প্রচারের জন্য নিজের পুত্র ও কন্যাকে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীলংকার ভাষা ও লিপি ভারতের পালি ভাষার অনুরূপ।

দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের চোল রাজারা সিংহল অধিকার করেছিলেন। সিংহলে এখনও দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান।

ভারতের এই জয়যাত্রা কি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের আদি সংস্করণ? একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ভারতের এই জয়যাত্রার প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতের যেসব ব্যক্তি ভারতের বাইরে গিয়ে

রাজ্যস্থাপন করেছিলেন তাঁরা সেই দেশে গিয়ে তাদের সঙ্গেই মিশে গিয়েছিলেন। সেখানকার জনগণকে শোষণ করে বা সেখানকার ধনরত্ন লুণ্ঠন করে এনে ভারতের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেননি। ভারত তার সংস্কৃতিকেই বিস্তার করেছে, কোন দেশকে শাসন করতে গিয়ে শোষণ করেনি।

তাই বলা যায়, ভারতীয়দের বহিরাভিযান ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় অভিযান। এমনকি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও ভারতের প্রতিপত্তি ছিল সভ্যতার আলোকপাতে। সে যুগে মধ্য এশিয়ায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থানীয় ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ছিল, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে ঐসব স্থান উন্নতি লাভ করেছিল।

অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মধ্যযুগে ভারতীয় সংস্কৃতি কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল?

(খ) চম্পা ও কম্বোজের ভারতীয় সভ্যতা যে বিস্তার লাভ করেছিল তা কেমন করে আমরা বুঝতে পারি?

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) অতীশ দীপঙ্কর কে? (খ) সুবর্ণ ভূমি কোন্ অঞ্চলকে বলা হত?

(গ) 'আঙ্কোরভাট' কি? (ঘ) বাণিজ্য ও ব্যবসার মধ্যে কোন্ কোন্ অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়? (ঙ) কম্বোজের হিন্দু রাজ্য কারা স্থাপন করেন? (চ) শৈলেন্দ্র রাজারা কোন পন্থী বৌদ্ধ ছিলেন? (ছ) শৈলেন্দ্র রাজাদের রাজগুরু কে ছিলেন?

(ঝ) চম্পা রাজ্যটি কোথায় অবস্থিত? বর্ত্তমানে এর নাম কি?

৩। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) তিব্বত রাজ—ভারতীয় লিপি নিজের দেশে প্রথম প্রচার করেন।

(খ) সিংহলের বর্ত্তমান নাম—।

(গ) দশম শতাব্দী—রাজারা সিংহল অধিকার করেন।

(ঘ) এখন যে দেশকে 'আনাম' বলা হয় তখন সেই দেশকে—বলা হত।

(ঙ) কম্বোজের রাজধানী ছিল—।

৪। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) জৈন ধর্মের দুটি মত—হীনযান ও মহাযান।
(খ) মধ্য এশিয়া থেকে চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম যায়।
(গ) অতীশ দীপঙ্করের বাল্য নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ।
(ঘ) কুবলাই খাঁ ছিলেন ব্রহ্মদেশের সম্রাট।
(ঙ) শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের শক্তির উৎস ছিল বিরাট নৌবহর।

৫। **সঠিক উত্তরটি দাগ দাও :**

(ক) চীন ও তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছিল জল/স্থল পথে।
(খ) ব্রহ্মদেশে/ইন্দোচীনে চম্পা ও কম্বোজ নামে দুটি শক্তিশালী হিন্দু-রাজ্য ছিল।
(গ) বর্তমান থাইল্যাণ্ড/কম্বোডিয়ার আগের দিনের নাম ছিল কম্বোজ।
(ঘ) দশম শতাব্দীতে চালুক্য/চোল রাজারা সিংহল অধিকার করেছিলেন।
(ঙ) শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন হীনযান/মহাযান বৌদ্ধ।

৬। **টীকা লিখ :**

বৌদ্ধ সঙ্গীতি, অতীশ দীপঙ্কর, সুবর্ণভূমি, শৈলেন্দ্র বংশ, আঙ্কোরথোম।

৭। **বাম ও ডান দিকের কথাগুলো সাজাও :**

বাম	ডান
বয়োন	অংকোরথোম-এর পুরাতন নাম।
চম্পা	একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।
যশোধরপুর	ইনি শৈলেন্দ্রবংশের গুরু ছিলেন।
অতীশ দীপঙ্কর	কম্বোডিয়ায় অবস্থিত ছিল।
কম্বোজ রাজ্য	ইন্দোচীনের আনাম প্রদেশে এই রাজ্য ছিল।
কুমার ঘোষ	অংকোরথোমে অবস্থিত মন্দির।
বালপুত্রদেব	নালন্দায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় | দিল্লীর সুলতানী শাসন

১। মুসলমানদের আগমণ ও রাজ্যস্থাপন : ২। সুলতানী শাসনে ভারতের অবস্থা : ৩। সুলতানী আমলের বাংলা :

মুসলমানদের আগমণ ও রাজ্যস্থাপন : অষ্টম শতাব্দীতে আরবের মুসলমানেরা সিন্ধু দেশ জয় করে ভারতে প্রথম রাজ্য স্থাপন করে।

এর তিনশ' বছর পরে গজনীর সুলতান মামুদ ভারত অভিযান করেন।

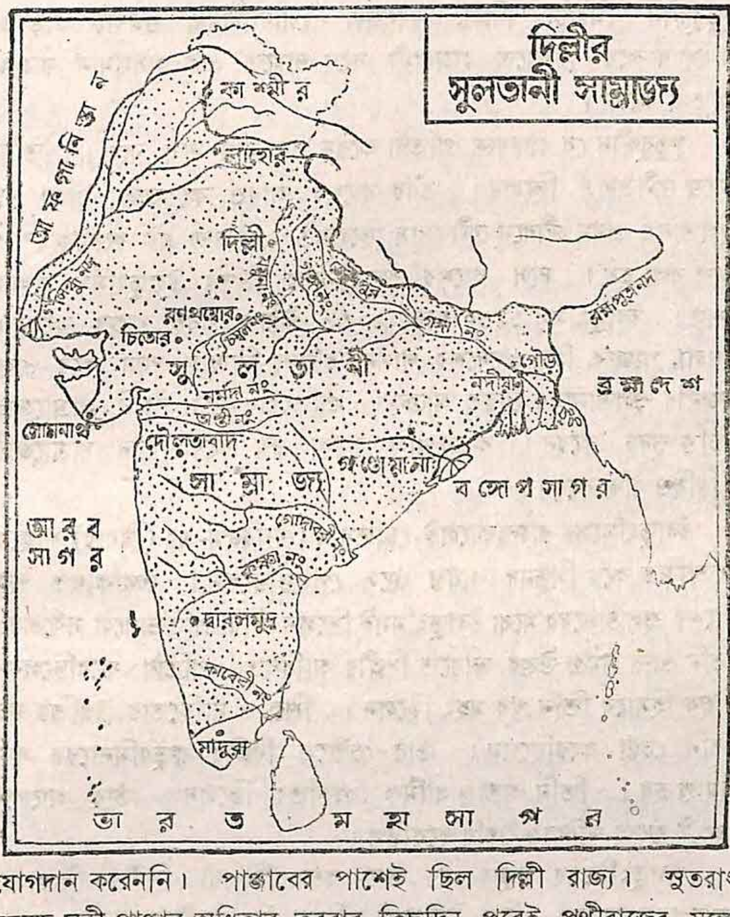
দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে আলাউদ্দীন নামে একজন তুর্কী মুসলমান ক্রীতদাস আফগানিস্তানের গজনীতে একটি ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তার জামাতা সবুক্তগীন গজনীর অধিপতি হলেন। এই সময় পাঞ্জাবে রাজত্ব করছিলেন শাহী বংশের হিন্দু রাজা জয়পাল। আফগানিস্তানের কিছু অংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। জয়পাল আর সবুক্তগীনের রাজ্য পাশাপাশি হওয়ার ফলে দুই দেশের রাজার মধ্যে বিরোধ বাধে এবং শেষ পর্যন্ত তা সংগ্রামে পরিণত হয়। এই যুদ্ধ অনেকদিন ধরে চলেছিল। জয়পালের মৃত্যুর পর তার পুত্র আনন্দপাল রাজা হওয়ার পরও গজনীর সাথে শাহী রাজ্যের যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত গজনী বহু যুদ্ধে জয়ী হয় এবং সবুক্তগীন সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তার করেন।

সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সুলতাল উপাধি ধারণ করেন।

মামুদ সতের বার ভারত অভিযান করে। মামুদ ভারতে রাজ্য স্থাপনের জন্য আসেননি। তিনি এসেছিলেন ভারতের ধনরত্ন লুঠ করতে। মুলতান, থানেশ্বর, কনৌজ, মথুরা প্রভৃতি বড় বড় শহর এবং গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির লুঠ করে অজস্র ধনরত্ন নিয়ে সুলতান মামুদ গজনীতে ফিরে যান। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর গজনীর রাজা হয় ঘুর বংশ। ঘুর বংশের সুলতানদের মধ্যে মহম্মদ ঘুরী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি গজনী ও কাবুলের শাসনভার লাভ করে হিন্দুস্থান (ভারত) জয় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ১১৭৪ খ্রীঃ তিনি মুলতান জয় করেন। তারপর তিনি সুলতান মামুদের শেষ বংশধর খসরু মালিককে পরাস্ত করে পাঞ্জাব কেড়ে নিলেন। এই সময় থেকে ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এই সূত্রে রাজপুত মৈত্র-সংঘের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ শুরু হয়।

সে সময় উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজপুত রাজারা শাসন করছিলেন। রাজপুত রাজার মধ্যে দু'জন ছিলেন সে সময় বিশেষভাবে ক্ষমতাশালী—একজন দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ, আর একজন কনৌজ ও কাশীর অধিপতি গাহড়োয়াল বংশীয় রাজা জয়চাঁদ। জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। গল্পে আছে, পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তাকে হরণ

করেছিলেন এবং সেইজন্যই পৃথ্বীরাজের সঙ্গে জয়চাঁদের শত্রুতা ছিল। এ গল্প সত্য কিনা জানা যায় না। তবে একথা ঠিক যে, যখন অন্যান্য রাজপুত রাজারা পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে মহম্মদ ঘুরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মনস্থ করেছিলেন তখন রাজা জয়চাঁদ তাঁদের সঙ্গে



যোগদান করেননি। পাঞ্জাবের পাশেই ছিল দিল্লী রাজ্য। সুতরাং মহম্মদ ঘুরী পাঞ্জাব অধিকার করবার কিছুদিন পরেই পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধল। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম দিকে থানেশ্বরের কাছে তরাইন নামক স্থানে মহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের কাছে পারজিত হয়ে মহম্মদ ঘুরী দেশে ফিরে যান। কিন্তু ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রচুর সৈন্যসহ আবার সম্মুখীন হন তরাইনের রণক্ষেত্রে। এবারও জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করলেন না। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাস্ত ও নিহত হন। মহম্মদ ঘুরী আজমীর

ও দিল্লী রাজ্য অধিকার করেন। ১১৯৪ খ্রীঃ মহম্মদ ঘুরী জয়চাঁদকে পরাস্ত ও নিহত করে কনৌজ নিজ রাজ্যের অধিকারে আনলেন।

মহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবক ভারতে মুসলমান রাজ্য বিস্তার করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন মহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। কুতুবুদ্দীন মিরাট, দিল্লী, রণথম্বর, গোয়ালিয়র, গুজরাট প্রভৃতি অধিকার করে দিল্লীতে রাজধানী করে ভারতে এক মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

কুতুবুদ্দীন যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম দাস বংশ। তিনি নিজে ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর বংশের আরও কয়েকজন রাজা বা সুলতানও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। এই জন্য এই বংশকে দাস বংশ বলা হয়। দাস বংশের সুলতানদের ভিতর ইলতুৎমিস হলেন শ্রেষ্ঠ। ইলতুৎমিস ১২১০ হতে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ দমন করে এবং গজনীর সুলতানদের ভারত আক্রমণ প্রতিরোধ করে তিনি সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। কতকগুলি অঞ্চল জয় করে তিনি সাম্রাজ্যের পরিধিও বৃদ্ধি করেন।

ইলতুৎমিসের রাজত্বকালেই চেঙ্গিস খাঁ খারিজম-এর (খিবার) শাহকে বিতাড়িত করে সিন্ধুনদ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন। তথাকথিত দাস বংশের সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিসই ছিলেন স্বীয় প্রতিভাবলে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানুষ হিসাবে তিনি খুব মহৎ ছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টাতে দিল্লীর কুতুবমিনারের কার্য সমাপ্ত হয়। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর আদেশে একটি সুন্দর মন্দিরও তৈরি হয়েছিল।

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা রিজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু উচ্চপদস্থ সর্দাররা তাঁর অধীনে থাকতে চাইল না। নানারকম ষড়যন্ত্র করে তাঁরা আলটুনিয়া নামক একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার হাতে রিজিয়াকে বন্দী করালেন। রিজিয়া বুদ্ধিমতি ছিলেন। তিনি আলটুনিয়াকে বিয়ে করেন এবং দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা রিজিয়া ও আলটুনিয়াকে পরাস্ত ও নিহত করল। অসাধারণ প্রতিভা থাকলেও রিজিয়াকে এইভাবে ধন, মান ও প্রাণ বিসর্জন দিতে হল।

রিজিয়া ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, চতুরা ও কর্মকুশলা। তিনি নিজে সেনাপতির পোশাক পরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন এবং পুরুষের বেশে দরবারে এসে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর নজর ছিল। তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং পণ্ডিত লোকদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। কিন্তু হীন, কুটিল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি টিকে থাকতে পারলেন না। তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন। রিজিয়া ছাড়া আর কোন মুসলমান রমণী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেননি।

রিজিয়ার পরে বহরাম ও মাসুদ নামে দু'জন অকর্মণ্য সুলতান ছ'বছর রাজত্ব করেন। তার ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আমীর ওমরাহদের চেষ্টায় ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন মহম্মদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত, দয়ালু ও ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি কোরান নকল করে অবসর সময় যাপন করতেন। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, কিন্তু শাসনকার্যে তেমন দক্ষ ছিলেন না। ১২৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর সেনাপতি গিয়াসুদ্দীন বলবন সুলতান হন। তখন তাঁর বয়স ষাট বছর।

বলবন ছিলেন কালোপযোগী সম্রাট। বৃদ্ধ হলেও তাঁর কার্যক্ষমতা ও মনের বল ছিল প্রচুর। এই সময়ে তুর্কী সর্দারেরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের বসে রাখা না গেলে ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যেও ভয়ানক বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দেয়। তাছাড়া, দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব দেখা দিল। মোঙ্গলদের তীব্র আক্রমণ চলছিল। তারা ইতিমধ্যে বাগদাদ, গজনী ইত্যাদি জয় করে সিন্ধুপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে বার বার হানা দিচ্ছিল।

গিয়াসুদ্দীন বলবন সর্দারদের ক্ষমতা হ্রাস করে নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বশীভূত করেন। বাংলা দেশের শাসনকর্তা তুঘ্রিল্ খাঁ বিদ্রোহ করলে তিনি নিজে বাংলাদেশে গিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন। ডাকাতদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে তিনি তাদের উৎখাত করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর কৃতিত্বের ফলে মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করে কোন সুফল লাভ করতে পারেনি। এইভাবে তিনি সর্বনাশের হাত থেকে দিল্লীকে রক্ষা করেন। বলবন অত্যন্ত

বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি কঠোর হাতে শত্রু দমন করতেন বটে, কিন্তু ন্যায় বিচারেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। সে সময় মোঙ্গলদের আক্রমণে বহু মুসলমান রাজা ও প্রজা তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর রাজত্বকালে দিল্লী মুসলমান সভ্যতার একটি কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যু হয়।

গিয়াসুদ্দীন বলবনের মৃত্যুর পরে তিন বছর দেশে নানা বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। সেই সুযোগে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে খলজী সর্দার জালাল-উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর ছয় বছর পরে সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্ব শুরু হয়। আলাউদ্দীন ছিলেন খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান।

আলাউদ্দীনের সময়েও মোঙ্গলরা দলে দলে এসে প্রায়ই ভারত সীমান্ত আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু তিনি দেশরক্ষার এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন যে প্রত্যেকবারেই তাদের বিফল হয়ে ফিরে যেতে হয়।

পর পর অনেকগুলি যুদ্ধ করে আলাউদ্দীন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী যেভাবে দাক্ষিণাত্য জয় করেছিল তা সত্যই বিস্ময়কর। তাঁর সময় দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং দিল্লী রাজ্য একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

আলাউদ্দীন বুঝেছিলেন যে একটি বিরাট সেনাবহিনী পোষণ না করলে সুলতানের ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সে জন্য তিনি স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের স্বল্প বেতনে যাতে খাওয়া পরা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অসুবিধা না হয় তার জন্য বাজারের সকল জিনিসের দাম তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই মধ্যযুগেই এই রকম মূল্য নিয়ন্ত্রণের নীতি উদ্ভাবন করে আলাউদ্দীন অসাধারণ মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আলাউদ্দীনের গুপ্তচরগণও বেশ কর্মদক্ষ ছিল।

আলাউদ্দীন সাধারণতঃ দিগ্বিজয়ী সম্রাট বলে পরিচিত। তাই তিনি দ্বিতীয় সেকেন্দার বা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। তবে শিল্পরসিক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি কুতুবমিনারের দ্বিগুণ একটি মিনার তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাসনকার্যে তাঁকে এতই ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তার সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তাই কুতুবমিনারের পাশে একটি বিরাট দরওজা করেই তাঁকে

ক্ষান্ত থাকতে হয়েছিল। এটি আলাই দরওজা নামে পরিচিত।

কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয় ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পরে আবার অনেক গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল। সুযোগ্য সেনাপতি মালিক কাফুর দিল্লীর সিংহাসনে বসতে চাইলেও তিনি সফল হননি। শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দীন তুঘলক সিংহাসন অধিকার করেন। মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

মহম্মদ তুঘলকের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তর্কশাস্ত্র, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কাব্য, অলংকার প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও ত্রুটি-বিহীন। অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে তিনি জীবন-যাপন করতেন। তাঁর মত দানশীল রাজা খুব কম দেখা যায়। তিনি নিয়মিত নমাজ পড়তেন।



আলাউদ্দীন খলজী



মহম্মদ বিন তুঘলক

কিন্তু এত গুণ থাকলেও তাঁকে 'পাগলা রাজা' বলে সকলে অভিহিত করত। একটু বিচার করে দেখলে বোঝা যায় যে, মহম্মদ তুঘলক পাগল ছিলেন না। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেক ভেবে চিন্তে তিনি এক একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরি করতেন। কিন্তু সেগুলি কার্যে

পরিণত করতে গিয়ে তিনি পাগল বলে প্রতিপন্ন হন। দেশের সাধারণ মানুষের এ জাতীয় পরিকল্পনা বিচার করার ক্ষমতা ছিল না। তারা তাই এসব পরিকল্পনার বিরোধিতা করত। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সুলতান তাই পরিকল্পনাগুলি ত্যাগ করতেন। ফলে তিনি সকলের কাছে হাস্যস্পদ হতেন। এরূপ কতকগুলি পরিকল্পনার কথা বলা হল।

একবার সুলতান ভাবলেন যে দেশের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী না হলে বিরাট সাম্রাজ্যকে শাসনে রাখা সম্ভব নয়। তাই তিনি দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করতে চাইলেন। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এ ব্যবস্থা সঙ্গত বলে মনে হয়। কিন্তু রাজ-দরবারে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এবং রাজকর্মচারীদের দিল্লীর উপর মায়া জন্মে গিয়েছিল। ব্যবসায়ীরা দিল্লী ছেড়ে যেতে রাজী হল না। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আদেশ দেন যে, বিনা বাক্যব্যয়ে সকলকে দেবগিরিতে যেতে হবে। অগত্যা সকলকে দেবগিরিতে যেতে হল। দেবগিরির নাম পরিবর্তন করে রাখা হল দৌলতাবাদ। বহু কষ্ট করে দিল্লীর অধিবাসীদের দৌলতাবাদে পৌছাতে হল। এদিকে সুলতান সেখানে দেখলেন যে রাজধানীর সবরকম সুবিধা দৌলতাবাদে নেই। দিল্লীর মুসলমান সর্দার ও আমির ওমরাহরা দাক্ষিণাত্যের হিন্দু পরিবেশকেও বেশ পছন্দ করল না। এসব কারণে কয়েক বছর পর সুলতান পুনরায় আদেশ দিলেন, দিল্লী ফিরে চলো। আবার বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে দৌলতাবাদের সকলকে দিল্লীতে ফিরতে হল।

মহম্মদ তুঘলক একবার চীন দেশের কাগজের নোটের অনুকরণে নিজ রাজ্যে তামার নোট চালু করেন। কিন্তু তামার নোট যাতে কেউ জাল করতে না পারে তার ব্যবস্থা করেননি। ফলে দেশে জাল নোটে ভরে গেল। শেষ পর্যন্ত কোষাগার থেকে অর্থ দিয়ে ঐ তামার নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়া হল। এতে রাজকোষের প্রচণ্ড ক্ষতি হল।

এভাবে ভাল পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেল। দেশের মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা এই সুযোগে স্বাধীন হতে চাইল। ফলে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। সুলতান, এই বিদ্রোহ দমন করতে বিভিন্ন স্থানে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। গুজরাটে এরকম এক

বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পর, তাঁর পিতৃব্য ফিরোজ শাহ সুলতান উপাধি নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি নিজে রাজকার্য দেখতে পারতেন না। মকবুল নামে একজন মন্ত্রীর হাতে শাসনভার ন্যস্ত ছিল। এই সুযোগ্য মন্ত্রীর শাসন কৌশলে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এল। তুঘলকের রাজত্বকালে চাষীদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। তাঁর শাসনে দেশে চাষ-আবাদ ভাল হতে লাগল, শস্য প্রচুর উৎপন্ন হওয়ায় দাম কমে গেল, ধনসম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে রাজকোষ পূর্ণ হল। তিনি দিল্লীর কাছে ফিরোজাবাদ নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ করলেন। জৌনপুর শহরও তাঁর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শাসনে দেশে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী দশ বছরে ছয় জন সুলতান রাজত্ব করেন। তাঁরা কেউই সুশাসক ছিলেন না। ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন হতে থাকল। এই বংশের শেষ সুলতান মামুদের রাজত্বকালে যখন সমরখন্দের আমীর তৈমুরলং ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন তখন তাঁকে বাধা দেবার ক্ষমতা রাজশক্তির ছিল না। তৈমুর লং দিল্লী অধিকার করে লুণ্ঠন করলেন। তারপর খিজির খাঁকে ভারতের অধিকৃত রাজ্যগুলির শাসনভার দিয়ে তিনি সমরখন্দ ফিরে গেলেন।

খিজির খাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত। তাঁর মৃত্যুর পর জৈষ্ঠ পুত্র মুবারক রাজা হন।

সৈয়দ বংশের পতনের পর ১৪৫১ খ্রীঃ বহলুল লোদী দিল্লীর সুলতান হন। তিনি দিল্লীর সর্বপ্রথম পাঠান সুলতান। তিনি যে বংশ প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম লোদী বংশ। এই লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে তৈমুর লং-এর বংশধর বাবর দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন ১৫২৬ খ্রীঃ প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে। এই সময় থেকে ভারতে মোগল শাসনের সূত্রপাত হয়।

সুলতানী শাসনে ভারতের অবস্থা : মুসলমানরা বাইরে থেকে এসে ভারতে বসবাস করতে শুরু করেন। কালক্রমে তারা সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে যায়।

প্রথম যখন তারা এদেশে এসেছিল তখন ভারতবাসীর সঙ্গে তাদের কোন মিল ছিল না। তাদের আচার-ব্যবহার-ভাষা-ধর্ম সবই ছিল

আলাদা। এর ফলে মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে ভারতের মানুষদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। পরে অবশ্য এই ভাব দূর হয়। হিন্দু মুসলমান এক দেশে এক সঙ্গে অনেক কাল বাস করার ফলে দু-সম্প্রদায়ের ভিতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একে অন্যের সংস্পর্শে আসে। ভারতীয় হিন্দুদের প্রভাব মুসলমানদের উপর পড়ে। মুসলমান সমাজের আচার-ব্যবহারও হিন্দুদের প্রভাবিত করতে থাকে। ভারতে ধন-সম্পদের অভাব ছিল না। সে সময় সমাজ ছিল কৃষি ভিত্তিক। দেশে অনেক শস্য উৎপন্ন হত। কিন্তু সম্পদের অধিকাংশ ভোগ করতেন রাজা এবং সম্ভ্রান্ত বংশের লোকরা। সম্ভ্রান্ত বলতে সুলতান, রাজকর্মচারী, হিন্দু রাজা এবং জমিদারদের বোঝায়। সমাজে পুরোহিত, মোল্লাদেরও প্রভাব ছিল যথেষ্ট। গরীবরা গায়ের রক্ত জল করে যে অর্থ রোজগার করত তা ভোগ করত অন্য লোকেরা। তখনকার রাজাদের ঐশ্বর্যের কথা বলতে গিয়ে আমীর খসরু বলেছেন, "রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা হল গরীবের রক্ত বসানো জমাট অশ্রুবিন্দু।" এই আমলে দেশে দাসপ্রথা ছিল। বড় লোকেরা ক্রীতদাস রাখত। সমাজে নারীরা সম্মান পেতেন। তবে তাঁদের পর্দা প্রথা মেনে চলতে হত। মেয়েদের কোন ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে এই সময় অনেক নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে। শহরবাসীরা সাধারণতঃ ছিল ব্যবসায়ী এবং কারিগর শ্রেণীর লোক। এযুগে অসংখ্য দক্ষ কারিগর অতি সুন্দর সুন্দর বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করত।

কৃষকরা গ্রামে বাস করত। তাদের জীবনে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং গরীবদের উপর হিন্দু ধর্মের কঠোরতা অসহনীয় হলে অনেকে সে সময় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে।

এই সময় সুলতানরাও অনেকে উদার ছিলেন। সরকারী কাজে হিন্দু মুসলমান যে কোন যোগ্য ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করতেন। কোন কোন সুলতান হিন্দুদের উপর হতে জিজিয়া কর তুলে নিয়েছিলেন।

এই আমলে ভারতীয় ভাষারও উন্নতি হয়। সুলতানরা স্থানীয় ভাষায় বই লিখতে উৎসাহ দিতেন। এই আমলে হিন্দী, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার উন্নতি হয়। সুলতানী আমলে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়। ফরাসী ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে নতুন ভাষা উর্দুর জন্ম হয়। সুলতানী যুগে ভারতের স্থাপত্য শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। হিন্দু

স্থাপত্যরীতির সঙ্গে মুসলমান স্থাপত্যরীতির মিলনে এক নতুন স্থাপত্যশিল্প গড়ে ওঠে। বাংলার গৌড়, উত্তর প্রদেশের জৌনপুর, গুজরাটের আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই মিশ্র স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন এখনও দেখা যায়।

এই যুগে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় করার চেষ্টা করেন কয়েকজন ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ। এদের ভিতর প্রসিদ্ধ হলেন কবীর, নানক এবং শ্রীচৈতন্যদেব। এদের ধর্ম প্রচারের মূল কথা হল হিন্দু মুসলমান একই ঈশ্বরের সন্তান। কবীর বলতেন, রাম রহিমে কোন ফারাক নেই। যিনি রাম তিনিই রহিম। ঈশ্বর সকল মানুষের অন্তরেই আছেন, কেউ উঁচু কেউ নিচু নয়, সকলেই সমান।

নানক প্রতিষ্ঠা করেন শিখধর্ম। তিনি পাঞ্জাবের একজন সাধারাণ ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। অসংখ্য ফকির সাধুদের সঙ্গে থেকে তিনি শিখধর্ম নামে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। তিনি জাতিভেদ মানতেন



নানক

না। সকল জাতির মানুষ তাঁর শিষ্য ছিল। নানকও বলতেন ভগবান এক, ভগবানের গুণকীর্তন করে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মুক্তি লাভ করতে পারে। বহু হিন্দু ও মুসলমান তাঁর শিষ্য ছিল। আদি গ্রন্থ হল শিখদের ধর্মগ্রন্থ।

আর একজন ভক্তি মতবাদে বিশ্বাসী হলেন কবীর। তিনি কাশীতে

এক তাঁতী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মীয় ভেদাভেদ তিনি মানতেন না। তাঁর মতে ভগবানকে ভালবাসাই বড় কথা এজন্য তিনি বহু সুন্দর দোঁহা রচনা করে যান।

চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনিও জাতিভেদ মানতেন না। তিনি বলতেন, ভক্তি থাকলেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আধ্যাত্মিক উন্নতি সকলেই করতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি মতবাদ বিশ্বাসী ছিলেন। সারা বঙ্গদেশে তিনি কীর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মকে বৈষ্ণব ধর্ম বলে। শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তন হল এই ধর্মের মূলকথা। ইনিও জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। হিন্দু



কবীর



চৈতন্যদেব

মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোক তাঁর শিষ্য ছিল।

সুলতানী যুগের শাসনব্যবস্থা : সুলতানী আমলে শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সুলতান। তাঁকে সর্ববিষয়ে আমীর ওমরাহরা সাহায্য করতেন। সামরিক বাহিনী ছিল সুলতানের শক্তির প্রধান উৎস। দেশের কোথায় কি ঘটছে তা জানবার জন্য দেশের গুপ্তচর বিভাগ কাজ করত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনের জন্য সুলতান শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। সুলতানের প্রধান আয় ছিল ভূমি

রাজস্ব। দেশের বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন কাজী।

সুলতানী আমলের বাংলা : বখতিয়ার খলজী বাংলা দেশ জয় করে দিল্লীর সুলতানের অধীনে এনেছিলেন। দিল্লী হতে বাংলা অনেক দূরে, তাই বাংলায় তখন দিল্লীর শাসন স্থায়ী হত না। বাংলার সুলতানরা বিদ্রোহ করতেন। স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাতেন। মহম্মদ তুঘলকের আমলে বাংলা পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে যায়।

দুটি মুসলমান রাজবংশ বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। একটি হল সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহর বংশ, অপরটি হুসেন শাহের বংশ। ইলিয়াস শাহ বাংলার দুই অংশ একত্রিত করে নিজের অধীনে এনেছিলেন। দিল্লীর সুলতানের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। প্রায় দেড়শ বছর রাজত্বের পর এই বংশের পতন হয়। এরপর কিছুকাল বাংলায় রাজত্ব করেন রাজশাহীর এক ব্রাহ্মণ জমিদার গণেশ। রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দীন নাম নিয়ে কিছুকাল দেশ শাসন করেন। ইলিয়াস বংশের মানুষেরা আবার সিংহাসন অধিকার করে। কিন্তু তাদেরও হটিয়ে রাজত্ব করে হাবসী ক্রীতদাসরা। হাবসী শাসনের সময় দেশে খুব অত্যাচার হত। এক বিদ্রোহে হাবসী শাসনের অবসান ঘটে এবং হুসেন শাহ নামে এক ব্যক্তি সিংহাসনে বসেন।

হুসেন শাহ দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল রাজা। হিন্দু-মুসলমান সকলকেই তিনি সমান চোখে দেখতেন। অনেক হিন্দুকে তিনি রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন। হুসেন শাহের বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করে শের শাহ বাংলাদেশ অধিকার করেন।

ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহর আমলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের ভিতর একতা বাড়ে। অনেক হিন্দু তখন মুসলমানের মত পোষাক পরত, দাঁড়ি রাখত এবং ফারসী ভাষা পড়ত। অনেক মুসলমানও হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে হিন্দুদের আচার-ব্যবহার পালন করতে থাকেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ফলে বাংলাদেশে সত্যপীর নামে এক নতুন দেবতার সৃষ্টি হয়। দুই সম্প্রদায়ের মানুষই সত্যপীরকে শ্রদ্ধা করত। ভক্তি ভরে সিন্নি প্রসাদ খেত।

লেখাপড়ার ব্যবস্থা তখন ছিল। হিন্দুরা টোলে পড়ত। মুসলমানদের জন্য ছিল মক্তবে। মৌলবীরা মক্তবে পড়াতেন।

সুলতানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উৎসাহ দিতেন। ফলে এই আমলে বাংলা সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়। বাংলায় রামায়ণ মহাভারত এই সময় রচিত হয়। সংস্কৃত বিশেষ করে ন্যায়শাস্ত্র আলোচনার জন্য নবদ্বীপ খুব প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। হুসেন শাহর আমলে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে বাংলায় সামাজিক ও ধর্মজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটান।

সুলতানদের আমলে বাংলায় স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। সুলতানরা বড় বড় অনেক মসজিদ নির্মান করেন। বিখ্যাত আদিনা মসজিদ, যত্নর সমাধি, একলাহী, বাগের হাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, কদমরসুল প্রভৃতি বড় বড় মসজিদ এই আমলের তৈরি।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলায় আর্থিক ব্যবস্থাও ছিল কৃষি নির্ভর। কৃষি নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রাজা, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষেরা বিত্তবান ছিল। সাধারণ কৃষক-চাষীর অবস্থা ভাল ছিল না। তখন জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল। আফ্রিকা দেশীয় পর্যটক ইবনবতুতা বলেছেন, বাংলার মত সস্তা জায়গা আর কোথাও নেই। এখানে এক পয়সায় একটা মুরগী পাওয়া যেত। পাঁচজন মানুষের একটি সংসার মাসে এক টাকায় অক্লেশে চলে যেত।

শিল্পদ্রব্যের ভিতর ঢাকার মসলিন জগৎ বিখ্যাত ছিল। বিদেশে মসলিনের খুব চাহিদা ছিল।

অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) সুলতানী শাসনে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? (খ) ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমলে বাংলার ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। **প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

(ক) দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধের ফলাফল কি? (খ) 'সত্যপীর' কি?
(গ) রাজা গনেশ কে? (ঘ) বাংলায় সুলতানী শাসনকালের কয়েকটি স্থাপত্য শিল্পের নাম বল।

৩। **এক কথায় উত্তর দাও :**

(ক) দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (খ) তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান

কে ছিলেন? (গ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধে কে ইব্রাহিম লোদীকে পারস্ত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন? (ঘ) শ্রীচৈতন্যদেব কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

৪। **ভুল সংশোধন কর:**

(ক) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

(খ) ইলতুৎমিস ছিলেন খলজী বংশের সুলতান।

(গ) হুসেন শাহী বংশের শাসনকালে বাংলা সাহিত্যের খুব অবনতি হয়।

(ঘ). ইবনবতুতা ছিলেন চীনদেশীয় পর্যটক।

৫। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর:**

(ক) দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহম্মদ ঘুরী। (খ) ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে চেঙ্গিস খাঁ ভারতে প্রবেশ করেন। (গ) মালিক কাফুর ছিলেন আলাউদ্দিন খলজীর সেনাপতি। (ঘ) ইলিয়াস শাহ বংশের শেষ রাজাকে পরাস্ত করে শের শাহ বাংলা অধিকার করেন। (ঙ) ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়।

৬। **টীকা লিখ:**

সুলতান মামূদ, মহম্মদ ঘুরী, রাজা গণেশ, পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, ইবন-বতুতা, শ্রীচৈতন্যদেব।

চতুর্দশ অধ্যায় — মধ্যযুগের অবসান

১। কনস্তান্তিনোপলের পতন: ২। আধুনিক যুগের সূচনা:

কনস্তান্তিনোপলের পতন: পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের পূর্বের অংশ কিন্তু তার-পরও আরো হাজার বছর টিকে ছিল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যকে বলা হয়, বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুরস্কের আক্রমণে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অবসান হয়। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের সময় হতে মধ্যযুগেরও অবসান ধরা হয়।

বাইজানটাইন বা কনস্তান্তিনোপল অধিকার করে অটোমেন তুর্কীরা। তুর্কী জাতির একদলের নাম ছিল সেলজুক তুর্কী। অপর দলের নাম অটোমেন তুর্কী। সেলজুকদের পর অটোমেনরা তুরস্কে প্রাধান্য পায়। এদের প্রথম রাজার নাম ছিল ওসমান। ইউরোপের

মানুষেরা ওসমান বলতে পারত না। বলত ওথম্যান। ওথম্যান হতেই তার মানুষদের নাম হয় অটোমেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অটোমেনদের রাজ্য কনস্তান্তিনোপলের দোড় গোড়ায় এসে পৌঁছায়। এর আগেই এককালের বিরাট বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশ হাতছাড়া হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় বাইজানটাইন সাম্রাজ্য বলতে বুঝাত কেবল কনস্তান্তিনোপল শহর, আর তার পাশের আট দশ কিলোমিটার জায়গা। তুর্কীরা এটা দখল করতে চেষ্টা করে। তাদের খুশী রাখতে কনস্তান্তিনোপলের সম্রাট নানা ভাবে চেষ্টা করেন। তুর্কীদের সাথে তার পরিবারের বিয়ে সাদিও দেন। কিন্তু এত করেও তিনি কনস্তান্তিনোপল রক্ষা করতে পারলেন না।

তুরস্কের সুলতান ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপল আক্রমণ করে এবং ৬৩ দিন শহরটি অবরোধ করে রাখে। সম্রাট ইউরোপের রাজাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। কোন রাজা তাকে সহায়তা করতে এলেন না। তিনি একাই যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন। বিজয়ী তুর্কী বাহিনী শহরে ঢুকে লুঠতরাজ শুরু করল, আগুন দিয়ে ঘর বাড়ি পুড়িয়ে শহরটি ধ্বংস করে ফেলল।

কনস্তান্তিনোপলের শেষ সম্রাটের নাম ছিল কনস্টানটাইন।

আধুনিক যুগের সূচনা: কনস্তান্তিনোপলের পতনে ইউরোপ বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এর ফলে ইউরোপে শুরু হয় নবজারণ। পঞ্চম শতাব্দীতে বর্বরদের আক্রমণের সময় গ্রীসের পণ্ডিতরা তাদের বইপত্র নিয়ে কনস্তান্তিনোপলে পালিয়ে এসেছিলেন। ধীরে ধীরে কনস্তান্তিনোপল হয়ে ওঠে গ্রীক-সভ্যতার কেন্দ্র। প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কাব্য সাহিত্য তাঁরা এখানে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কনস্তান্তিনোপল পতনের পর বইপত্র নিয়ে তাঁরা আবার চলে এলেন ইউরোপের ইটালীতে। এখানে এসে মানুষদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। অল্পকালের ভিতর রোম, ফ্লোরেনস, মিলান, ভেনিস প্রভৃতি শহরগুলো প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠল।

ইউরোপের মানুষ এর আগে প্রাচীন গ্রীক-সভ্যতার কথা জানত না। এটা হল তাদের কাছে একেবারে নতুন জিনিস। এই নতুন শিক্ষার সংস্পর্শে এসে তাদের মনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। তারা নতুন ভাবে চিন্তা করতে শিখল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা সব কিছুই

সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা শুরু করল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর, বিশেষ করে ক্রুসেড যুদ্ধে বিদেশীদের সংস্পর্শে আসার পর হতে ইউরোপের মানুষ নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছিল। নব-জাগরণের নতুন শিক্ষা এই পরিবর্তনকে আরও দ্রুত ও ব্যাপক করে তুলল। ইউরোপের মানুষের মনের এই পরিবর্তনের নাম রেনেসাঁ বা নবজাগরণ।

ইতিমধ্যে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। শহর ও নগর বড় হওয়ায় সামন্ততন্ত্র ভেঙ্গে পড়তে থাকে। দেশে দেশে জাতীয়তা বোধ জোরদার হয়। নানা জায়গায় নতুন জাতি ও নতুন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়। জনগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। মানুষ নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। জার্মানীর অধীনতা হতে মুক্তি লাভের জন্য ডাচ বা ওলন্দাজরা উইলিয়াম অব অরেঞ্জের নেতৃত্বে সংগ্রাম করে। ইংলণ্ডের রাজা, জনগণের অধিকার হ্রাস করতে চাইলে তারা বিদ্রোহ করে। জনগণের নেতৃত্ব দেন সাইমন-ডি-মনট্‌ফোরড। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইংলণ্ডের কৃষকরা বিদ্রোহ করে।

ইউরোপের মানুষ আগে বাইরে যেত না। পাদরীরা তাদের শিখিয়েছিল পৃথিবীটা হল থালার মত চেপ্টা একটা জিনিস। এর কিনারায় গেলেই পড়ে মরতে হবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একথা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। আকাশের তারা আর জ্যোতিষ্কদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে পোলাণ্ডের বিজ্ঞানী কোপারনিকাস আবিষ্কার করলেন পৃথিবীর আকার গোল। এই সত্য আবিষ্কারের জন্য কোপারনিকাসকে সাজা পেতে হয়েছিল। পৃথিবীকে জানার আগ্রহ এবং নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের মোহ অনেক মানুষের মনে উৎসাহ এনেছিল। এর ফলে অজানা সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিয়ে কলম্বাস আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করে ফেললেন।

আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের পর হতে শুরু হল আধুনিক যুগের ইতিহাস। আধুনিক যুগের কথা তোমরা উপরের ক্লাসে উঠে পড়বে।

অনুশীলনী

১। সাধারণ প্রশ্ন :

(ক) ইউরোপে নবজাগরণের ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের কিভাবে অবসান ঘটে ?

(খ) কোপারনিকাস কে ? তিনি কি আবিষ্কার করেছিলেন ?

(গ) সাইমন্-ডি-মনট্ফোর্ড কে ?

৩। শূন্যস্থানে কথা বসাও :

(ক) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতনের পর—যুগের অবসান ঘটে।

(খ) কনস্তান্তিনোপল অধিকার করে—তুর্কীরা।

(গ) —অধিকারের পর হতে শুরু হল আধুনিক যুগের ইতিহাস।

(ঘ) কনস্তান্তিনোপলের শেষ সম্রাটের নাম ছিল—।

(ঙ) পূর্ব রোম সাম্রাজ্যকে বলা হয়—সাম্রাজ্য।

(চ) অটোমেন তুর্কীদের প্রথম রাজার নাম—।

৪। সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :

(ক) পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম/পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়।

(খ) তুরস্কের সুলতান ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রোম/কনস্তান্তিনোপল আক্রমণ করেন।

(গ) উইলিয়ম অব অরেঞ্জ ছিলেন ইংরাজ/ওলন্দাজ নেতা।

(ঘ) সাইমন-ডি মণ্টফোর্ডের নেতৃত্বে ইংলণ্ড/ইংলণ্ডের কৃষকরা বিদ্রোহ করে।

৫। টীকা লিখ :

অটোমেন, সাইমন-ডি-মণ্টফোর্ড, উইলিয়ম অব অরেঞ্জ, কোপারনিকাস।

কালপঞ্জী—১

খ্রীষ্টাব্দ	ইউরোপ	এশিয়া	ভারতবর্ষ	চীন
৪০০	বর্বরগণ কর্তৃক রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ— এ্যালারিক, এটিলা। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতন (৪৭৬ খ্রীঃ)	হজরত মহম্মদ হিজিরা (৬২২ খ্রীঃ)	গুপ্তসাম্রাজ্য শ্বেত হূণদের আক্রমণ—স্কন্দগুপ্ত তোরমান, মিহির-গুল, বালাদিত্য। যশোবর্মণ, হর্ষবর্দ্ধন, হিউয়েন সাঙ্‌	তাই স্থুঙ্‌ তাঙ্‌ রাজত্ব (৬১৮-৯০৭ খ্রীঃ)
৬০০	জাষ্টিনিয়ান	বাগ্‌দাদে আব্বাসি বংশ (৭৫০-১২৫৮ খ্রীঃ)	আরবীয়দের ভারত আক্রমণ (৭১১ খ্রীঃ)	
৮০০	শার্লম্যান্‌ (৭৬৮-৮১০ খ্রীঃ)	হারুন-অল্‌-রশিদ সেলজুক তুর্কীদের অভ্যুদয়		
১০০০	ক্রুসেড যাত্রা—(১০৯৫-১২৯১ খ্রীঃ) প্রথম রিচার্ড	সালাডিন	সুলতান মামুদ মহম্মদ ঘোরী কুতুবউদ্দিনের দিল্লী অধিকার (১১৯২-৯৩)	কুবলাই খান মার্কো পোলো
১২০০				
১৪০০	তুর্কীগণ কর্তৃক কনস্তান্তিনোপল অধিকার (১৪৫৩ খ্রীঃ)	চেঙ্গিস খান অটোমেন তুর্কীগণের অভ্যুদয়	সুলতানী রাজত্ব (১১৯৩-১৫২৬)	
১৫০০			বাবর	

কালপঞ্জী—২

খ্রীষ্টাব্দ	ভারতবর্ষ	বাঙ্গলা	ইউরোপ	এশিয়া
৪০০	হূণ আক্রমণ—স্কন্দগুপ্ত, বালাদিত্য,			হজরত মহম্মদ
	মিহিরগুল, যশোবর্মণ।			তাই-সুঙ
৬০০	হর্ষবর্দ্ধন, হিউয়েন সাঙ্	শশাঙ্ক		
	দাক্ষিণাত্যে চালোক্য ও পল্লব রাজত্ব			
	আরবগণের ভারতবর্ষ আক্রমণ			হারুন-অল্-রসিদ
৮০০		পালবংশ—গোপাল,	শার্লম্যান	
		ধর্মপাল		
১০০০	সুলতান মামুদের আক্রমণ			
	পৃথ্বীরাজ,মহম্মদ ঘোরী	সেনবংশ—বল্লালসেন		
	কুতুবউদ্দিন—দাস বংশ	লক্ষ্মণসেন		
	খল্জী বংশ—আলাউদ্দিন খল্জী			চেঙ্গিস খান
১২০০	তুঘ্লক বংশ—মহম্মদ তুঘলক,			কুবলাই খান
	ফিরুজ তুঘ্লক,	ইলিয়াস শাহী বংশ		মার্কো পোলো
১৪০০	তৈমুর লঙের আক্রমণ	গণেশ		
	সৈয়দ ও লোদী বংশ—	হাব্সী রাজত্ব	অটোমেনগণ কর্তৃক	
	বাবর—	হোসেন শাহ,	কন্স্তান্তিনোপল অধিকার	
১৫০০	মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা (১৫২৬ খ্রীঃ)	শ্রীচৈতন্যদেব	(১৪৫৩ খ্রীঃ)	